হুযূরের মহব্বতকে তুলনা করিয়া দেখার সুযোগ ঘটে নাই। তুলনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকপক্ষে স্বাভাবিক মহব্বতও হুযূরের জন্যই বেশী আছে। যেমন, উক্ত রঈসের ঘটনায় আমি এইমাত্র বর্ণনা করিয়াছি। দ্বিতীয়ত স্বাভাবিক মহব্বত কাম্যও নহে। অকাম্য বিষয়ে ত্রুটি থাকা ক্ষতিকর নহে। কাম্য মহব্বতে অর্থাৎ, বিবেচনাপ্রসূত মহব্বতে ত্রুটি হইলে ক্ষতি অবশ্যই হইবে। আপনাদের মধ্যে আল্লাহ্র ফযলে সেই ত্রুটি নাই। তবে অস্থির কেন হইতেছেন?

যাহারা স্বাভাবিক মহব্বতকে যথেষ্ট মনে করে, উপরোক্ত বর্ণনায় তাহাদের ভুল বুঝা গিয়াছে। বেরেলী শহরে একবার আমি জুমুআর নামাযের পর ঃ

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰادِقِيْنَ ○

আয়াতের বিষয়বস্তু অবলম্বনে ওয়ায করিয়াছিলাম। তাহাতে ঈমানের পূর্ণতালাভ এবং কামেল লোকের সংসর্গ অবলম্বনের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরবর্তী রাত্রে সেই স্থানেই ইহার বিপরীত বক্তৃতা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে ঃ "শ্রোতৃগণ! পরহেযগারীর প্রয়োজন নাই। নামায-রোযারও আবশ্যক নাই। কেবল রাসূল (দঃ)-এর মহব্বতের প্রয়োজন। অতঃপর শরাবই পান কর বা অন্য কিছু কর, অবশ্যই তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আর এই ওয়াহাবীরা কখনও মুক্তি পাইবে না।"

ইহারা আমাকে জ্বালাইবার জন্য এই বক্তৃতা করিয়াছিল। বোকারা আমাকে জ্বালাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশাবলীর বিরোধিতা করিয়াছে এবং হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র আত্মাকে কষ্ট দিয়াছে। আচ্ছা, তাহাদের কথায় আমার জ্বলিবার প্রয়োজন কি? জ্বলিলে তাহারাই দোযখের আগুনে জ্বলিবে। আমি যাহাকিছু বর্ণনা করিয়াছি, নিজে বানাইয়া বলি নাই; বরং কোরআন-হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছি। ইহার বিরোধিতা করিলে আমার কি ক্ষতি হইল? ক্ষতি হইলে তাহাদেরই হইল।

এই অবস্থা অবশ্য দুঃখজনক। শুধু মহব্বতের বুলি আওড়াইল এবং আনুগত্যের সময় আসিলে নবী (দঃ)-এর নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা আরম্ভ করিয়া দিল। মোটকথা, যে ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-এর আদেশ-নিষেধ পালন করে, কাম্য ও বাঞ্ছনীয় মহব্বত তাহার আছে। কোন কোন লক্ষণে ত্রুটি থাকিলেও চিন্তিত বা অস্থির হওয়া উচিত নহে।

কেহ কেহ আর একটি কথার কারণেও নিজেদের মধ্যে মহব্বতের ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে। তাহা এই যে, তাহাদের মনে হুযূর (দঃ)-এর তেমন বেশী আকর্ষণ হয় না; বরং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকর্ষণ অধিক হয়। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বতের ত্রুটি রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করে। স্মরণ রাখুন, ইহা শুধু স্বাভাবিক মহব্বতের বিভিন্ন অবস্থার প্রভেদ মাত্র। আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিবেচনাপ্রসূত মহব্বত উভয়ের অন্তরেই আছে। অর্থাৎ, যাহার অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি অধিক এবং হুযূরের প্রতি কম আকর্ষণ রহিয়াছে, আর যাহার অন্তরে হুযূরের প্রতি অধিক ও আল্লাহ্র প্রতি কম আকর্ষণ রহিয়াছে, এরূপ মহব্বত কম হওয়ার ধোঁকা হযরত রাবেয়া বছরীর মনেও হইয়াছিল। তিনি স্বাভাবিক এবং জ্ঞান-বুদ্ধিপ্রসূত মহব্বতের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই।

হযরত রাবেয়া বছরীর ঘটনা এইরূপ—একবার তিনি হুযূর (দঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়া লজ্জাবশত দৃষ্টি নিম্নমুখী করিয়া ফেলিলেন এবং আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট

খুবই লজ্জিত। আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বত আমার অন্তরে এত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, আপনার মহব্বতের জন্য একটুও জায়গা রাখে নাই। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ঃ "হে রাবেয়া! খোদার সঙ্গে মহব্বত রাখাই আমার সহিত মহব্বত রাখা।" কেননা, খোদার সহিত মহব্বত রাখার নির্দেশ তো হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই দিয়াছেন। আর আল্লাহ্র সহিত মহব্বত রাখাতে হুযূরেরই আদেশ পালন করা হয় এবং ইহাই জ্ঞানপ্রসূত মহব্বত।

আমি বলিতেছিলাম, কুফরীর কারণ দুইটি বিষয় বলিয়া কোরআন হইতে জানা যায়—(১) আখেরাতের প্রতি অমনোযোগিতা। (২) দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ।

এতদপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম ঃ আমি দুনিয়া উপার্জন করিতে নিষেধ করি না; বরং দুনিয়ার মোহে মত্ত হইতে নিষেধ করি। আরও একটু বাড়াইয়া ইহাও বলিয়াছিলাম ঃ সকল অবস্থায় দুনিয়া প্রিয় হওয়া বারণ করি নাই; বরং একথা নিষেধ করিয়াছি যে, জ্ঞানের বিচারে যেন দুনিয়াকে অধিক প্রিয় সাব্যস্ত করা না হয়। দুনিয়ার প্রতি কাহারও স্বাভাবিক মহব্বত অধিক হইয়া গেলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু জ্ঞানত তাহা হওয়া উচিত নহে। প্রসঙ্গক্রমে স্বাভাবিক মহব্বত ও জ্ঞানানুগ মহব্বতের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া কথা লম্বা হইয়া গিয়াছে।

যাহাহউক, কাফেরদের কুফরীর কারণ হইল দুনিয়ার মহব্বত এবং দুনিয়ার মোহে মগ্ন হইয়া যাওয়া। এই কারণেই ইহুদীরা ঈমান আনয়ন করিতে পারে নাই। কেননা, তাহাদের সন্দেহ ছিল—আমরা তো এখন সমাজের পীর সাজিয়া বসিয়াছি। মুসলমান হইলে মুরীদে পরিণত হইব এবং হাদিয়া-নেয়ায যাহাকিছু এখন পাইতেছি বন্ধ হইয়া যাইবে। অথচ হুযূরের মুরীদান ইসলাম গ্রহণের পর এত প্রচুর হাদিয়া-নজরানা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, ঐ পীরদের বাপ-দাদা স্বপ্নেও তাহা কোনদিন দেখিতে পায় নাই। ছাহাবায়ে কেরাম পারস্যাধিপতি ও রোমানাধিপতির যাবতীয় ধন-ভাণ্ডার জয় করিয়াছিলেন এবং দুনিয়া তাঁহাদের পদলেহী চাকর-চাকরানী হইয়াছিল। যে দুনিয়ার মহব্বত এই কাফেরদিগকে ঈমান আনয়নে বারণ করিয়াছিল, তাহারাও ঈমানের বদৌলতে পূর্ব হইতে অধিক দুনিয়াকে লাভ করিতে পারিত, না পাইলেও খোদা তো তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইতেন। ইহারা খোদার সন্তুষ্টির মর্যাদা এই জন্য দিতে পারে নাই যে, তাহারা আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী এবং অবিশ্বাসী ছিল। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের কি হইল? আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দিতেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মতি ও সন্তোষের অমর্যাদা করিতেছি। যেহেতু অদ্যকার অনুষ্ঠানের মূলে ছিল মহিলাদের অনুরোধ, কাজেই এখন আমি এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়াছি।

**নারীর উপর সংসারাসক্তির প্রাধান্য ঃ** মেয়েলোকদের মধ্যে সংসারাসক্তি খুবই প্রবল। তাহাদের মধ্যে গহনাপত্র এবং সাজ-পোশাকের লোভ অনেক বেশী। তদুপরি অবস্থা এই যে, চারি জন স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া বসিলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দুনিয়ার আলোচনাই চলিতে থাকে। ধর্মের কোন আলোচনাই উঠে না। স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহাদের মজলিসসমূহের কয়টি মজলিসে ধর্মীয় আলোচনা হইয়া থাকে। পাপজনক কথা হইতে বিরত থাকিয়া দুনিয়ার আলোচনা অধিক পরিমাণে করা যদিও জায়েয আছে, কিন্তু এই জায়েযের সীমারেখা পাপের সহিত মিলিত। যে ব্যক্তি দুনিয়ার আলোচনায় অধিক লিপ্ত থাকে, সে অবশ্যই পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

اَلَا اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَّاِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهٗ وَمَنْ رَّتَعَ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّقَعَ فِيْهِ

"স্মরণ রাখুন, প্রত্যেক রাজার নিষিদ্ধ এলাকা আছে। আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ এলাকা তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ এলাকার আশেপাশে ঘুরাফেরা করে, সে শীঘ্রই উহাতে পতিত হইবে।" বুযুর্গ লোকেরা বলিয়াছেন ঃ জায়েয কার্যসমূহও নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থান। অভিজ্ঞতায়ও তাহাই প্রতীয়মান হয়। কাজেই মুসলমানদের উচিত অধিকাংশ সময় এবাদতে মশ্‌গুল থাকা, মুবাহ্ কার্যেও অধিক লিপ্ত না হওয়া। সুতরাং দুনিয়ার আলোচনা অধিক করা—অর্থাৎ, মজলিসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই আলোচনাই চলিতে থাকা, অবশ্যই গুনাহের ভূমিকা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহার উৎস সেই সংসারাসক্তিই বটে, যাহা আজকাল মেয়েলোকদের মধ্যে অধিক প্রচলিত আছে। এই কারণেই স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্মপরায়ণা খুব কম হইয়া থাকে। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের মধ্যে ধার্মিকতা দেখা যায়, তাহা শুধু সংসারাসক্তি কম হওয়ার দরুন। আমাদের পার্শ্ববর্তী পানিপথের স্ত্রীলোকেরা অধিক ধর্মপরায়ণা বলিয়া শুনা যায়। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন মেয়েলোক হাফেযে কোরআনও রহিয়াছেন। কেহ কেহ সাত কেরাআতে পারদর্শিনী, প্রায় সমস্ত স্ত্রীলোকই কোরআন শরীফ পড়িতে সক্ষম, নামাযীও তাঁহাদের মধ্যে খুব বেশী। এতদসঙ্গে দুনিয়ার দিক হইতেও তাঁহারা বেশ সচ্ছল অবস্থায় আছেন। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূসম্পত্তি আছে। খাওয়া-পরার দিক হইতে সকলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাঁহাদের এই সচ্ছলতা শুধু এই কারণে যে, তাঁহাদের মধ্যে দুনিয়ার লোভ অধিক নাই। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি—তথাকার মেয়েলোকেরা খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। এমন কি, তাঁহাদের নব-বধূরাও গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া থাকে। মূল্যবান কাপড়ের প্রতি অধিক লোভ করে না। তাহা না হইলে সমুদয় জমিদারী গহনা-কাপড়ের দায়েই নিলাম হইয়া যাইত। ফলত যে সমস্ত মহল্লায় এসমস্ত ব্যাধি ঢুকিয়াছে, সেখানে দারিদ্র্য এবং অভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। খেতি-বাড়ী সবকিছুই মহাজনের নিকট রেহানে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আচ্ছা! এমন গহনা-কাপড়ে কি আনন্দ পাওয়া যায়, যাহার দরুন একটা ঘরই বিনাশ হইয়া যায়? আমাদের এখানে তো এই অবস্থা যে, ঘরে খাওয়ার কিছু না থাকিলেও আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী যাইতে সম্মানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রেশমী বা জর্জেটের কাপড় এবং স্বর্ণের অলঙ্কার অবশ্যই চাই। অথচ দরিদ্র লোক কোন দিন মূল্যবান কাপড় পরিয়া সম্মানিত হইতে পারে না। কেননা, তাহার প্রকৃত অবস্থা সকলেরই জানা আছে।

কানপুরে এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাহার মাথায় জরির কাজ করা টুপি এবং পরনে অতি আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক দেখিয়া আমি তাহাকে নবাব কিংবা উচ্চস্তরের নেতৃস্থানীয় লোক বলিয়া মনে করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, খুব সম্ভব ১০/১২ টাকা মাসিক বেতনের কনষ্টেবল। আমার খুব স্মরণ আছে, বেতনের কথা জানিবামাত্র লোকটি আমার দৃষ্টিতে নিতান্ত হেয় হইয়া গেল। যে পোশাকের কারণে এতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার দৃষ্টিতে কিছুটা সম্মানের পাত্র ছিল, তাহাই এখন তাহার অপমান এবং হীনতার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা এমন একটি বিষয়, দুনিয়ার সকলেই তাহা অনুভব করিতে পারে।

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাকে একজন নেতৃস্থানীয় লোককে সুপারিশের জন্য সঙ্গে লইয়া চাকুরীর সন্ধানে কালেক্টরের নিকট গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যোগ্যতা কিছুই

নাই। কাজেই পরিষ্কার বলিয়া দিলেন, "বড় দরের চাকুরীর যোগ্যতা নাই, নিম্নস্তরের চাকুরী তাহার মর্যাদাবিরোধী।" সুতরাং ঘৃণার সহিত উত্তর দিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

দুঃখের বিষয়, ইহারা এতটুকুও বুঝে না যে, যে সম্মানের জন্য তাহারা সম্পত্তি বিনাশ করিতেছে, উহা বিনাশ করিয়া তাহা লাভ করা যায় না, হাতে রাখিয়াই লাভ করা যাইতে পারে। অবস্থাপন্ন ভূস্বামী যত সাধারণ পোশাকেই থাকুক না কেন—সর্বত্র সম্মানিত হয়। পক্ষান্তরে কেহ জমিজমা হারাইয়া যত মূল্যবান পোশাকই পরুক না কেন, কোথাও সম্মান পায় না। অবশ্য উচ্চস্তরের চাকুরী কিংবা শিল্প-নৈপুণ্যের মত অন্য কোন কারণে সম্মান লাভের উপযুক্ত হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যোগ্যতার অভাবে মুসলমানদের পক্ষে চাকুরী লাভ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এদিকে কোন শিল্প-নৈপুণ্য লাভেও তাহাদের কোন ঝোঁক নাই। সুতরাং কেবল পোশাকে কেমন করিয়া সম্মান লাভ হইবে? কেহ কোন প্রকার চাকুরী একটা পাইলেও তাহাতে আবার অপমানকর পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ, চাকুরী করে ৫০ টাকা বেতনে; কিন্তু ৫০০ টাকা বেতনের চাকুরিয়ার মত আড়ম্বর। কোথাও যদি কম বেতনের গোমর ফাঁক হইয়া যায়, তখন অন্য এক আবরণ চড়াইয়া প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিতে হয়।

কোন একস্থানে সমবেত কতিপয় স্ত্রীলোকের মধ্যে নিজ নিজ স্বামীর বেতন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। কেহ বলিলঃ আমার স্বামীর বেতন ১০০ টাকা, কেহ বলিলঃ ২০০ টাকা। তথায় উপস্থিত ছিল খুব জাঁকজমকপূর্ণ গহনা-কাপড় পরিহিতা এক দরিদ্রা স্ত্রীলোক। তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার স্বামীর বেতন কত? তখন স্বামীর বেতন মাত্র ২০ টাকা প্রকাশ করিতেও তাহার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল, আবার মিথ্যা বলিলেও পাছে লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা মনে করিল। কাজেই সে বলিলঃ বেতন তো মাসিক ২০ টাকাই বটে, কিন্তু 'মাশাআল্লাহ্' উপরি যথেষ্ট পায়। জনৈকা স্ত্রীলোক তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলঃ হতভাগী! তওবা কর। হারাম উপার্জনের উপর মাশাআল্লাহ্ বলিতেছিস। ঈমান নষ্ট হইয়া যাইবে, কাফের হইয়া যাইবি।

**চিন্তার প্রয়োজনঃ** আমি যথার্থ বলিতেছি, যাহারা দুনিয়া অন্বেষী, অথচ ইহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, স্বরূপ না জানার কারণেই তাহারা ইহার প্রতি আসক্ত হইতেছে। স্বরূপ চিনিতে পারিলে আসক্তির পরিবর্তে ঘৃণা হইত। মনে করুন, ময়লার উপর চাঁদির পাত জড়াইয়া দেওয়া হইল এবং কেহ হালুয়া মনে করিয়া ইহার আশায় বসিয়া রহিল। কিংবা কোন বৃদ্ধা পেত্নীকে যদি লাল বর্ণের রেশমী কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয় এবং কেহ তাহাকে সুন্দরী ও রূপসী রমণী মনে করিয়া তাহার সহিত প্রেমের দাবীদার হয়, কিন্তু আবরণ উন্মোচন করিতেই তাহার মহব্বতের তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কবি বলেনঃ

بسے قامت خوش که زیر چادر باشد - چوں باز کنی مادر مادر باشد

"চাদরে আবৃতা অনেক সুঠাম-সুডৌল নারীর আবরণ উন্মোচন করিলে দেখা যাইবে, সে 'নানী।' আর এক কবি বলেনঃ

عارفے خواب رفت در فکرے - دید دنیا بصورت بکرے
کرد از وی سوال کاے دلبر - بکر چونی بایں همه شوهر
گفت يك حرف با تو گويم راست - که مرا هرکه بود مرد نخواست
وانکه نامرد بود خواست مرا - زاں بکارت همیں بجاست مرا

"কোন একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক দুনিয়াকে স্বপ্নে দেখিল—বৃদ্ধা অথচ কুমারী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কেমন কথা? এত স্বামীর ঘর করিয়াও তুমি এখন পর্যন্ত কুমারী। সে বলিলঃ যাহারা পুরুষ তাহারা আমাকে স্পর্শ করে নাই। আর যাহারা আশেক ছিল তাহারা নামরদ, তাহাদিগকে আমি স্পর্শ করি নাই। এই কারণেই এখন পর্যন্ত আমি কুমারী।" বাস্তবিক, দুনিয়া তো এখন বৃদ্ধাই হইবে, যুবতী কিরূপে থাকিবে? হাজার হাজার বৎসর বয়স হইয়াছে, তথাপি আমরা তাহার জন্য প্রাণ দিতেছি এবং মনে করিতেছি, সে বড়ই সুন্দরী যুবতী।

বন্ধুগণ! আপনারা তো দুনিয়াকে বোরকার উপর হইতে দেখিয়াই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ বোরকা উঠাইয়া ইহাকে দেখিয়া লইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। ইহাও لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ আয়াতের অন্যতম তফ্‌সীর। অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখেরাতের স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা কর। উভয়টিকে বোরকা খুলিয়া ভালরূপে দেখিয়া লও, তবেই তোমাদের মনে দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা এবং আখেরাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হইবে। দুনিয়া বাহিরে নানা প্রকার সুন্দর সাজে সজ্জিত। কিন্তু ভিতর কলুষময়, সাপ এবং বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে আখেরাত বাহিরে অপ্রীতিকর পরিবেশ এবং নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট পরিবেষ্টিত। কিন্তু ভিতরে অতিশয় সুন্দরী এবং মনমাতান মাহ্‌বুবা। তাহার একটি মাত্র দৃষ্টির সম্মুখে সপ্তখণ্ড বসুন্ধরা কিছুই নহে। আমাদের প্রতি দোষারোপ করা হয়, আমরা দুনিয়া সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের চেয়ে আমরা দুনিয়াকে ঢের বেশী চিনি। আমাদের প্রতি যে দুনিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করারই নির্দেশ রহিয়াছে, কাজেই আমরা দিবা-রাত্র দুনিয়া সম্বন্ধে চিন্তা করি। এমন কি আমরা ইহার তত্ত্বকথা পর্যন্ত জানিয়া ফেলিয়াছি। তোমরা কিছুই জান না, কেবল বোরকার উপর হইতে উহার সাজ-সজ্জা দেখিয়া প্রেমে মত্ত হইয়াছ।

আমি দুনিয়াকে অবহেলা করার তা'লীম দিতেছি না; বরং ইহাই বলি যে, দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ কর, পূর্ণ মনোযোগ দাও, যাহাতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পার। অপূর্ণ ও ভাসাভাসা মনোযোগ দিও না, যাহাতে কেবল বাহিরের সাজ-সজ্জায়ই মগ্ন থাক। আমি অদ্যকার ওয়াযের জন্য যে আয়াতটি মনোনীত করিয়াছি, তাহাতেও একথার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই কাফেরদের কুফরীর কারণ বলিয়াছেনঃ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا "কাফেরেরা কেবল দুনিয়ার বাহিরের অবস্থাই জানে", এ কারণেই তাহারা ঈমান আনয়নে বিরত রহিয়াছে। অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলে তাহাদের এরূপ অবস্থা হইত না। এখানেও দুনিয়ার বাহ্যিক রূপকে নিন্দনীয় বলা হইয়াছে। প্রকৃত স্বরূপকে নিন্দা করা হয় নাই। দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ দুনিয়াদারগণ জানে না, কেবল ধার্মিক লোকেরাই জানে। আমি লক্ষ্ণৌ শহরে এক মজলিসে যাহা বলিয়াছিলাম, ইহা তাহারই সদৃশ। আমি সেখানে বলিয়াছিলামঃ লোকে বলে, আলেমগণ উন্নতির পথে বাধা প্রদান করিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা হইতেছে। আমরা উন্নতি করিতে কেমন করিয়া নিষেধ করিতে পারি? কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে উন্নতি করার জন্য তো আদেশই করিয়াছেনঃ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "নেক কাজে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা কর" এবং উন্নতির সার ইহাই। অতএব, আমাদের উপর উন্নতি করা তো ফরয। ইহাতে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ যে, আলেমগণ তোমাদের চেয়ে অধিকতর উন্নতিকামী। কেননা, আজ পর্যন্ত তোমরা উন্নতিকে শরীঅতের দৃষ্টিতে ফরয বলিয়া স্বীকার কর নাই। কোরআনের সাহায্যে ইহার

অবশ্য করণীয়তাও প্রমাণ কর নাই; বরং তোমরা পার্থিব জীবনের এবং সামাজিক সুবিধার্থে 'উন্নতি উন্নতি' বলিতেছ। অতএব, উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। কেবল প্রভেদ এতটুকু যে, আমরা বলিতেছি, নেক কাজে উন্নতি করা আবশ্যক। আর তোমরা নেক কাজের ধার ধার না। কিন্তু উন্নতি যে শুধু নেক কাজেই হওয়া উচিত তাহা তোমরাও অস্বীকার করিতে পার না।

প্রথমত, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং উন্নতিকে নেক কাজের সহিত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন— فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ দ্বিতীয়ত, নেক কাজের বিপরীতপক্ষে মন্দ কাজ। মন্দ কাজে উন্নতি করা উদ্দেশ্য বলিয়া কোন জ্ঞানবানই বলিতে পারে না। এখন মতভেদ শুধু একথার মধ্যে রহিল যে, তোমরা যে কাজে উন্নতির চেষ্টা করিতেছ তাহা নেক কাজ কিনা? তোমরা টাকা-পয়সার উন্নতি করিতেছ—ধর্ম ঠিক থাকুক বা না থাকুক। আর আমরা ধর্ম ঠিক না রাখিয়া আর্থিক উন্নতি করাকে স্ফীতির উন্নতি মনে করি। যাহার দেহের কোন স্থান ফুলিয়া যায়, বাহ্যদৃষ্টিতে তাহারও উন্নতিই হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অবনতির দিকে যাইতে থাকে। ধর্ম ছাড়িয়া টাকা-পয়সার উন্নতিরও এই অবস্থা। অতএব, এরূপ কখনও বলিও না যে, আলেমগণ উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী; বরং এরূপ বল যে, তাঁহারা বিশেষ ধরনের উন্নতি নিষেধ করিয়া থাকেন, যাহা স্ফীতির উন্নতি সদৃশ। অন্যথায় মূলত সত্যিকারের উন্নতি তোমাদের চেয়ে তাঁহারাই অধিক কামনা করেন।

এইরূপে আমি বলি যে, আমরা দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে নিষেধ করি না; বরং দুনিয়ার প্রতি অপূর্ণ মনোযোগ দিতে নিষেধ করিতেছি। আমরা বলিতেছি, দুনিয়ার অবস্থার প্রতি এমন পূর্ণ মনোযোগ দাও, যাহাতে ইহার প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পার। আমরা দুনিয়ার প্রতি মনোযোগ দিতে কেমন করিয়া নিষেধ করিতে পারি? অথচ কোরআন আমাদিগকে দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করিতে আদেশ করিতেছে। ফলত আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ দুনিয়ার অবস্থার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অতএব, কোন এক বুযুর্গ লোক বলিয়াছেনঃ حَلَالُهَا حِسَابٌ وَّحَرَامُهَا عَذَابٌ "দুনিয়ার অবস্থা এই যে, ইহার হালাল অংশ হিসাবমুক্ত নহে এবং ইহার হারাম অংশের জন্য আযাব হইবে।" অতএব, ইহার কোন অংশই কষ্টশূন্য হইল না।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেনঃ দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ খাদ্য-পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খাদ্যের মধ্যে সর্বোত্তম মধু। ইহা মৌমাছির 'বমি।' পানীয় দ্রব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট পানি। ইহা উপভোগে মানুষের সঙ্গে শূকর পর্যন্ত অংশীদার আছে। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল রেশমী বস্ত্র। ইহা এক প্রাণীর মুখনিঃসৃত লালা। আর স্ত্রীলোকের অবস্থা এই যে,

تَرْبهُنَّ لِاَحْسَنِ مَوَاضِعِهَا ـ وَيُتَعَمَّدُ مِنْهَا اَنْتَنُ مَوَاضِعِهَا

"স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করার সময় তোমরা তাহাদের সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি কর। অথচ তাহার দেহের সর্বাপেক্ষা অধিক পূতিগন্ধময় স্থান উদ্দিষ্ট বস্তু হইয়া থাকে।" এসমস্ত বিষয়ের প্রতি চিন্তা করিলে দুনিয়ার হাকীকত অন্যান্য সকলের উপরও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইমাম গায্‌যালী (রঃ) কোন এক বুযুর্গ লোকের উক্তির উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেনঃ আখেরাতের

তুলনায় দুনিয়া ঘৃণার পাত্র তো আছেই; এতদ্ব্যতীত দুনিয়া ইহার সত্তাগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও ঘৃণার যোগ্য। কেননা, দুনিয়া অন্বেষণকারী কোন শান্তির মধ্যে নাই।

**দুনিয়াদার অস্থিরতা ও চিন্তামুক্ত নহেঃ** বন্ধুগণ! আপনারা দুনিয়াদার লোকের বাহ্যিক সাজ-সজ্জার প্রতি লক্ষ্য করিবেন না; বরং তাহাদের কাছে থাকিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা লক্ষ্য করুন। দেখিতে পাইবেন, তাহাদের কেহই শান্তিতে নাই। পক্ষান্তরে আখেরাত অন্বেষণকারিগণ সকলেই দিব্যি আরামে আছেন। তাহাদের অবস্থার নমুনা দেখুনঃ

نه باشتر بر سوارم نه چوں اشتر زیر بارم ۔ نه خداوند رعیت نه غلام شهر یارم

"আমি উষ্ট্রারোহীও নহি, উষ্ট্রের মত ভারবাহীও নহি, প্রজাপালও নহি, বাদশাহর আজ্ঞাবহ গোলামও নহি।" অথচ দুনিয়াদারকে দেখুন, কোথাও সন্তানের চিন্তা, কোথাও স্ত্রীর চিন্তা, কোথাও অভাবের চিন্তা, কোথাও মোকদ্দমার ধান্দা, কোথাও জমিদারীর ঝামেলা, কোথাও উৎসবের বা শোকের অনুষ্ঠান। আর আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের এসব কোনই ঝামেলা নাই। আমি বলি না যে, তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা কিংবা অভাব-অভিযোগের সম্মুখীন হইতে হয় না। তাঁহারাও এসমস্ত বিষয়ের সম্মুখীন হন। তাঁহাদের মুখ হইতে আঃ! উঃ! শব্দও উত্থিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ভিতরে ভিতরে তজ্জন্য খুশীও হইয়া থাকেন। আপনারা হয়তো বলিবেন, এই দুই বিপরীত অবস্থার সমাবেশ কিরূপে হয়? আমি বলি, হাসপাতালের একজন সাধারণ রোগীও এই দুই প্রকারের বিপরীত অবস্থাকে একত্রিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। কোন রোগীর ফোড়া হইলে ডাক্তার কোন কারণে ক্লোরোফরম না শুঁকাইয়া যদি তাহার ফোড়ায় অস্ত্রোপচার করে, তবে সে কান্নাকাটিও করিবে, চীৎকারও করিবে, 'আঃ! উঃ'ও করিবে। কিন্তু পরে ডাক্তারকে ৫০ টাকা ভিজিট এবং কিছু পুরস্কারও দিয়া দিবে। অতএব, দেখুন, এই লোকটি আঃ! উঃ!-ও করিল, কান্নাকাটি এবং চীৎকারও করিল, কিন্তু মনে মনে এসব বিষয়ের জন্য খুশীও হইল। এই কারণেই তো ডাক্তারকে ফি ও পুরস্কার দিয়াছে। এইরূপ আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অবস্থা। ইহা বাহ্যিক কষ্ট এবং খোদার মহব্বতের একত্র সমাবেশের প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত। তত্ত্বজ্ঞানী উভয়কে একত্রিত করিয়া দেখাইয়া দেয়। তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এরূপ ক্ষেত্রে ঘাবড়াইয়া গিয়া বলেঃ

درمیان قعر دریا تختہ بندم کردۂ ۔ باز میگوئی که دامن تر مکن هوشیار باش

"মধ্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে নির্দেশ দিতেছ, সাবধান? আঁচল যেন না ভিজে।" এই কবিতাটি মূলে একটি আরবী কবিতার অনুবাদ। আরবী কবিতাটি হইল—

القاه فى اليم متكونا وقال له ۔ اياك اياك ان تبتل بالماء

আল্লামা শা'রানী (রঃ) লিখিয়াছেনঃ আল্লাহ্ পাকের শানে এই কবিতাটি প্রয়োগ করা হারাম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও সাধ্যের বাহিরে কষ্ট দেন না। যেমন, এই কবিতায় সাধ্যাতীত কষ্টের দোষারোপ করা হইয়াছে। আর তত্ত্বজ্ঞানীরা যে কষ্ট ও সন্তোষকে একত্রিত করিয়া থাকেন, উহার প্রকৃত রূপ এই যে, তাঁহারা বিবেক অনুযায়ী সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং স্বভাবত যন্ত্রণা ভোগ করেন। ইহাকেই মাওলানা রূমী (রঃ) নিজ মস্‌নবীতে ব্যক্ত করিতেছেনঃ

نا خوش تو خوش بود بر جان من ۔ دل فدائے یار دل رنجان من

কষ্টের ব্যাপারে স্বভাবত কষ্ট অবশ্যই হয় বটে ; কিন্তু জ্ঞানত যেহেতু— هرچه از دوست می آید نیکوست "বন্ধুর পক্ষ হইতে যাহাকিছু আসে—ভাল।" কাজেই কষ্টও মধুর বলিয়া মনে হয়। অতএব, "দুনিয়া অন্বেষণকারিগণ দুঃখ-কষ্টে এবং আখেরাতকামীগণ শান্তিতে আছে"—কথাটি সম্পূর্ণ সত্য।

**দুনিয়া কাম্য হওয়ার বিভিন্ন স্তরঃ** বন্ধুগণ! সেই মহাপুরুষদের ন্যায় তোমরাও দুনিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা কর। আলোচ্য আয়াতে যাহের (ظاهر) শব্দ যোগ করিয়া 'বাতেনের' প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অভ্যন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সারমর্ম এই যে, দুনিয়ার মধ্যে উহার কাম্য হওয়ার দুইটি দিক রহিয়াছে। প্রথমত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য হইতে পারে। দ্বিতীয়ত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাম্য হইতে পারে ; কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়া অস্থায়ী এবং আখেরাত স্থায়ী। স্থায়ীর মোকাবিলায় অস্থায়ী কখনও কাম্য হওয়ার যোগ্য নহে। আর উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে—যেই উদ্দেশ্যে মানুষ দুনিয়ার অন্বেষণ করিয়া থাকে—তাহাও দুনিয়া দ্বারা হাসিল হইতে পারে না ; বরং তাহাও আখেরাতের দ্বারাই লাভ করা যায়।

এখন বুঝিয়া দেখুন, দুনিয়া কোন্ উদ্দেশ্যে কামনা করা হয় ? বলাবাহুল্য, সুখ-শান্তির জন্যই দুনিয়া অন্বেষণ করা হয়। এখন চিন্তা করুন, সুখ-শান্তি কি ? কেহ কেহ উত্তম পোশাক, উত্তম বাড়ী এবং উত্তম খাদ্যকে সুখ-শান্তি মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তো সুখ-শান্তির উপকরণমাত্র। সুখ-শান্তি প্রকৃতপক্ষে অন্য বস্তু।

দেখুন, যদি কাহারও ফাঁসির হুকুম হয় এবং এসমস্ত সুখ-শান্তির উপকরণ তাহার আয়ত্তে থাকে, এসমস্ত উপকরণে কি তাহার বিন্দুমাত্র আনন্দ হইতে পারে ? কখনই না। যদি কোন অরাজকতার দেশে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তোমাকে অনুমতি দেওয়া হইতেছে, ইচ্ছা করিলে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবার জন্য অন্য কাহাকেও দিতে পার অথবা নিজে ঝুলিতে পার। এখন যদি এই লোকটি ঘোষণা করিয়া দেয় যে, "আমার পক্ষ হইতে যে ব্যক্তি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে স্বীকার করিবে, আমার সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে দান করিব।" বলুন, কোন দরিদ্র হইতে দরিদ্র ব্যক্তিও কি ফাঁসিকাষ্ঠ বরণ করিয়া লইবে ? বলাবাহুল্য, কখনও করিবে না।

অতএব, বুঝা গেল, এসমস্ত উপকরণ দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ নহে ; বরং দুনিয়ার বহিরাকৃতি মাত্র। প্রকৃত স্বরূপ অন্য কিছু—অর্থাৎ, অন্তরের শান্তি। আমি দাবী করিয়া বলি, ধর্মের অন্বেষণেই অন্তরের শান্তি হাসিল হইতে পারে, দুনিয়ার অন্বেষণে কখনও হইতে পারে না। আল্লাহ্ওয়ালাগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা মা'শুকানা শানে রাখিয়াছেন, বাদ্শাহী পোশাক, রাজকীয় খাদ্য এবং বহুসংখ্যক মুরীদ-মো'তাকেদ দান করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না ; বরং যে সমস্ত খোদাগতপ্রাণ মহাপুরুষ সর্বদ্বারে বিতাড়িত ; পায়ে জুতাও নাই, কাপড়ও ছেঁড়া-ফাটা, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি দাবী করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারাও অন্তরের শান্তির ব্যাপারে দুনিয়াদারদের চেয়ে অগ্রগামী রহিয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা এইঃ

رُبَّ اَشْعَثَ اِغْبَرَّ مَدْفُوْعٌ عَلَى الْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهٗ ○

"আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁহাদের এই আবদার আছে যে, তাঁহারা যদি কোন কথার উপর শপথ করিয়া বসেন যে, 'এরূপ হইবেই।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের কসম পূর্ণ করিয়া দেন।"

এই মর্মে আরেফ শীরাযী বলিতেছেন ঃ

گدائے میکدہ ام لیك وقت مستی بیں ـ که نـاز بر فلك وحکم بر ستارہ کنم

"শরাবখানার দ্বারের ফকীর আমি, কিন্তু মত্ততার সময় আসমান এবং নক্ষত্রকে স্বীয় আজ্ঞাবহ মনে করি।" তিনি নিজের এমন দস্ত অবস্থায়ও আনন্দিত এবং মত্ত আছেন। হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহামের নিকট কেহ অভাব ও অনাহারের অভিযোগ করিলে তিনি বলিতেন ঃ তুমি বিনা পরিশ্রমে ও চেষ্টায় যে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইয়াছ, উহার মূল্য কি বুঝিবে? ইহার মূল্য ইব্রাহীম ইবনে আদ্‌হামের কাছে জিজ্ঞাসা কর, যে রাজ্য ছাড়িয়া অভাব-অনাহার খরিদ করিয়াছে এবং দুনিয়ার যাবতীয় কষ্টকে কষ্টই মনে করে না। আর বলে ঃ

نا خوش تو خوش بود بر جان من ـ دل فداے یار دل رنجان من

দেখুন, মৃত্যুর কষ্টই দুনিয়াতে সবচাইতে বড় কষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ সেই মৃত্যুর জন্য পাগল। আরেফ শীরাযী বলেন ঃ

خرم آں روز که زیں منزل ویراں بروم ـ راحـت جاں طلبم وز پے جانـاں بروم
نذر کردم که گر آیـد بسر ایں غم روزے ـ تا در میکـدہ شاداں وغـزلخـواں بروم

এখন বলুন, যাঁহারা মৃত্যুতেও এত আনন্দিত, তাঁহারা অপরাপর দুঃখ-কষ্টে কেমন করিয়া অস্থির হইবেন? যাহা বলিলাম, তাহা শুধু কথার কথাই নহে; বরং ঘটনাবলী হইতেও দেখা যায়, বাস্তবিকই মৃত্যুর সময় তাঁহাদের অবস্থা এরূপ আনন্দময়ই হইয়া থাকে। নক্‌শেবন্দিয়া তরীকার ওলীদের উপর শান্তভাব এবং চিশ্‌তিয়া তরীকার ওলীদের উপর চাঞ্চল্যভাব প্রবল থাকে। নক্‌শেবন্দিয়া তরীকার এক বুযুর্গ লোক এন্তেকালের সময় ওছিয়ত করিলেন যে, আমার জানাযার সহিত একজন মধুর স্বরবিশিষ্ট লোক এই কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে অনুগমন করিবে ঃ

مفلسـانیم آمدہ در کوئے تو ـ شیئـا ﷲ از جمـال روئے تو
دست بکشا جانب زنبیل ما ـ آفریں بر دست وبر بازوئے تو

"অভাবগ্রস্তরূপে তোমার গলিতে আসিয়াছি। তোমার সৌন্দর্য ও মহিমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। তোমার হাত ও বাহুর মঙ্গল হউক। আমার থলিয়ার দিকে হস্ত প্রসারিত কর।"

কোন চিশ্‌তী ওলী এরূপ ওছিয়ত করিলে 'হালের' প্রাবল্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইত। কেননা, দগ্ধীভূত হওয়া এবং প্রজ্বলিত হওয়া তাঁহাদেরই বিশেষত্ব।

**আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ মৃত্যুকে ভয় করেন না ঃ** কিন্তু সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালা মাত্রই মৃত্যুকে ভয় করেন না। বস্তুত নিশ্চিন্তভাব অবশ্যই কিছু ছিল, তাই এরূপ ওছিয়ত করিয়াছিলেন। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, মৃত্যুর পরে কাহারও কবিতা পাঠে তিনি কি স্বাদ পাইয়া থাকিবেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঘটনাবলীদৃষ্টে বুঝা যায়, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ মৃত্যুর পরেও স্বাদ পাইয়া থাকেন। হযরত সুলতান নেযামুদ্দীন রাহেমাহুল্লাহ্‌র জানাযার সহিত গমনকারী জনৈক মুরীদ শোকের আতিশয্যে এই কবিতাগুলি পড়িয়াছিলেন ঃ

سرو سیمینا بصحرا می روی - سخت بے مہری کہ بے ما می روی
اے تماشاگاہ عالم روئے تو - تو کجا بہر تماشا می روی

"হে আমার সুঠাম-সুডৌল মাহ্বুব! আপনি জঙ্গলের দিকে প্রস্থান করিতেছেন। কতই না নিষ্ঠুরতা! আমাকে সঙ্গে নিতেছেন না। আপনার চেহারা স্বয়ং জগতের তামাশা-স্থল। তবে আপনি আবার প্রমোদ-ভ্রমণে কোথায় যাইতেছেন?"

পীরের এন্তেকালে মুরীদানের অবস্থা যাহা হয় তাহা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে। উক্ত মুরীদ তেমন অবস্থার মধ্যেই উক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ হযরত সুলতানজীর হাত কাফনের ভিতর হইতে উপরের দিকে উঠিল। ঠিক যেমন, 'ওয়াজ্‌দের' অবস্থায় হইয়া থাকে। সঙ্গীয় লোকেরা উক্ত মুরীদকে বারণ করিল, "গযল পড়া বন্ধ কর, বলা যায় না—কি হইতে কি হয়?" কিছুক্ষণ পরে হাত আবার কাফনের ভিতরে সোজা হইয়া গেল। নক্‌শেবন্দী পীর ছাহেবের ঘটনা মৃত্যুর পূর্ববর্তী আর হযরত সুলতানজীর ঘটনা পরবর্তী। আল্লাহ্ওয়ালাগণের 'আলমে বরযখের' অবস্থা সম্বন্ধে কোন বুযুর্গ বলিয়াছেনঃ

گر نکیر آید وپرسد کہ بگو رب تو کیست - گویم آنکس کہ ربود ایں دل دیوانۂ ما

"নাকীর আসিয়া আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার খোদা কে?' তখন আমি বলিবঃ "যিনি আমার উন্মত্ত হৃদয় ছিনাইয়া লইয়াছেন।"

তবে এসমস্ত মহাপুরুষ মৃত্যুর চিন্তা কেন করিবেন? কোন কোন তফ্‌সীরের বর্ণনা অনুসারে নিম্নোক্ত আয়াতে তাঁহাদের মৃত্যুর অনতিপূর্বকালের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لَّاتَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○ نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ ○ؕ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফেরেশ্‌তারা তাঁহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়া দেন এবং শান্ত ও নিশ্চিন্ত করিয়া দেন। অতঃপর আসে কিয়ামতের পালা। ইহাও তাঁহাদের পক্ষে চিন্তার বিষয় নহে। যেমন, কোরআন ঘোষণা করিতেছেঃ

لَايَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

"কিয়ামতের মহা ভয় তাঁহাদিগকে চিন্তিত করিবে না এবং তাঁহাদের সহিত ফেরেশ্‌তাগণ সাক্ষাৎ করিবেন।"

হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান ছাহেব হইতে এই মর্মে আমি একটি কবিতা শ্রবণ করিয়াছিঃ

عاشقاں را باقیامت روز محشر کار نیست - عاشقاں را جز تماشائے جمال یار نیست

" কিয়ামত এবং হাশরের দিনে আশেকদের কোন চিন্তা-ভাবনা নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু বন্ধুর রূপ দর্শনের তামাশা ভিন্ন আর কিছু নহে।" এখন বলুন, যাহাদের নিকট হাশরের দিন

‘দীদারে এলাহী’ হাসিল হওয়ার দিন, তাঁহারা কিয়ামতের ভয়ে অস্থির হইবেন কেন? মাওলানা রূমী (রঃ) মস্নবীতে লিখিয়াছেনঃ আল্লাহ্ওয়ালাগণ যখন দোযখের উপরিস্থ পুলছেরাত পার হইয়া বেহেশ্তে পৌঁছিবেন, তখন তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিবেনঃ “আমরা শুনিয়াছিলাম, পুলছেরাত দোযখের উপরে অবস্থিত। কোথায়, আমরা তো পথে দোযখ দেখিলাম না?” তখন ফেরেশ্তাগণ বলিবেনঃ “তোমরা পথে একটি উদ্যান দেখিয়াছিলে?” বলিবেনঃ হাঁ, ফেরেশ্তারা বলিবেনঃ “উহাই দোযখ ছিল। তোমাদের আমলের বদৌলত উহা উদ্যানের আকৃতিতে তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।” অতএব, তাঁহাদের জন্য তো দোযখও ইব্রাহীম খলীল আলাইহিস্সালামের অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় উদ্যানে পরিণত হইবে। সুতরাং তাঁহাদের চেয়ে অধিকতর আরাম কাহার ভাগ্যে জুটিবে?

হাদীস শরীফে আছেঃ মুসলমান যখন পুলছেরাত অতিক্রম করিবে, দোযখ তাহাদিগকে বলিবেঃ جُزْ يَا مُؤْمِنُ فَاِنَّ نُوْرَكَ اَطْفَا نَارِىْ “হে মুসলমান! তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও। তোমার জ্যোতি আমার আগুন নিভাইয়া দিয়াছে।” তফ্সীরকারকগণ ইহার তফ্সীরে বলিয়াছেনঃ মুমেন যেমন দোযখ হইতে ‘পানাহ্’ চাহিতেছে, দোযখও তদ্রূপ মুমেন হইতে ‘পানাহ্’ চায়। সমস্ত দুঃখ-কষ্টের সেরা দোযখই যাহার হইতে ‘পানাহ্’ চায়, তাঁহার খুশীর সীমা কোথায়? বাস্তবিকই দোযখ মুমেন হইতে ‘পানাহ্’ চাহিতেছে। কেননা, দোযখের সঙ্গে মুমেনের কোনই সম্পর্ক নাই। যেখানে সম্পর্কই নাই সেখানে উভয়পক্ষই অপরপক্ষ হইতে বিমুখ থাকিবে। কোন এক কবি এই মর্মটিকে অন্য ভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

میں جو ہوں قابل دوزخ توگناہوں کے سبب ۔ لیك دوزخ نے کیا کیا جو مرے قابل ہے

“আমি তো পাপের কারণে দোযখের উপযোগী হইয়াছি। কিন্তু দোযখের কি দোষ—যাহার ফলে আমাকে তাহার ভিতরে রাখার উপযোগী হইল?” বাস্তবিকই মুসলমান এক বিচিত্র বস্তু! দোযখ তাহা হইতে দূরত্ব কামনা করে এবং সে দোযখ হইতে দূরত্ব কামনা করে।

**ঈমানের দৌলত মর্যাদার যোগ্যঃ** বন্ধুগণ! ঈমানের দৌলতকে মর্যাদা দিন। ইহাতে বুঝা গেল, দুনিয়া অন্বেষণকারীরা দুনিয়া হইতে প্রকৃতপক্ষে কিছুই লাভ করিতে পারে না। তাহারা তো কেবল বাহ্যিক উপকরণ লইয়াই বসিয়া রহিয়াছে। দুনিয়ার প্রাণবস্তু তাঁহারাই ভোগ করিতেছেন যাঁহাদিগকে তোমরা দুনিয়া বর্জনকারী বলিয়া মনে করিতেছ। ইহাতে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার প্রাণবস্তু দুনিয়ার অন্বেষণে পাওয়া যায় না; বরং দুনিয়াকে ত্যাগ করিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং আফসোসের বিষয়—যে বস্তুকে ঘৃণা করাই উহাকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা, মানুষ তাহার জন্য অনুরাগে আত্মহারা।

এ পর্যন্ত প্রমাণ করিয়াছি যে, দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি আল্লাহ্ওয়ালাগণই ভোগ করিতেছেন। এখন কথা হইল, এই শান্তির রহস্য কি? তাহা এই যে, আল্লাহ্ওয়ালাগণ নিজেদের জন্য কোন নির্দিষ্ট অবস্থা স্থির করেন না। কেননা, কিছু স্থির করিলেই দাবী করা হয়, “আমাদেরও অস্তিত্ব আছে, আমরাও একটা কিছু বটে। আমাদের স্থির করারও মূল্য আছে।” বস্তুত তাঁহাদের রুচিই হইল নিছক আত্ম-বিস্মৃতি। তাঁহারা নিজদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ, নিজেদের ইচ্ছা এবং মতামতকে লোপ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, কবি বলেনঃ

خود ثنا کردن زمن ترك ثناست ۔ این دلیل هستی خطاست

"তাঁহারা তো নিজেদের মতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাও করেন না। কেননা, তাহাও নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ।" অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিতেছি। আমি কোন্ যোগ্যতাসম্পন্ন যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করিতে পারি?

তবে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের মুখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কেন এবং হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা কেন করিয়াছেন? ইহার উত্তর দার্শনিকগণ দিতে পারেন না। সূফিয়ায়ে কেরাম হাদীস দ্বারাই ইহার জওয়াব দিয়াছেন। হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছে—بِىْ يَسْمَعُ وَبِىْ يَنْطِقُ وَبِىْ يَبْصُرُ "আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ আমারই দ্বারা শুনে, আমারই দ্বারা কথা বলে এবং আমারই দ্বারা দেখে।" কাজেই তাঁহাদের মুখে উচ্চারিত প্রশংসা তাঁহাদের কৃত নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং করিয়া থাকেন। যেমন, তূর পর্বতের বৃক্ষ হইতে আওয়ায আসিয়াছিলঃ اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ তবে কি বৃক্ষ নিজেকে رَبُّ الْعَالَمِيْنَ বলিয়া দাবী করিয়াছিল? কখনই না; বরং কেহ বৃক্ষের দ্বারা বলাইয়াছিল এবং অন্য এক সত্তা ইহার বক্তা ছিলেন।

আফসোস! মুফ্‌তীগণ মানছুর হাল্লাজের اَنَا الْحَقُّ -কেও যদি তূর-এর বৃক্ষের اَنَا اللّٰهُ -এর ন্যায় মনে করিত, তবে বেচারাকে শূলিতে চড়ান হইত না। কিন্তু আলেমগণ মনে করিয়াছিলেন—তূর-এর বৃক্ষ বোধমান পদার্থ নহে এবং মানছুর বোধমান। অথচ বেচারা শুধু অপরের উক্তি অনুকরণ করিতেছিল। যেমন, আদালতের অর্ডার্লী মোকদ্দমার পক্ষগণকে ডাকার ব্যাপারে শুধু আবৃত্তিকারী। বড় হইতে বড় লোককেও নাম ধরিয়া ডাকেঃ "অমুকের পুত্র অমুক হাযির হ্যায়।" কেহ তাহার সে কথায় অসন্তুষ্ট হয় না। কেননা, সকলেই জানে ইহা তাহার নিজের উক্তি নহে; বরং সে আবৃত্তিকারী মাত্র, অন্য সময়ে তাহার সাধ্য কি উক্ত বড় লোকের সম্মুখে আসে কিংবা তাঁহার সহিত কথা বলে? নাম উচ্চারণ করা তো দূরেরই কথা। নাম লইয়া তাঁহাকে আহ্বান করাও তো অতি গুরুতর অপরাধ।

এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ প্রশংসার সময় আল্লাহ্‌রই উক্তির আবৃত্তি করিয়া থাকেন। নিজেরা প্রশংসা করেন না। নিজদিগকে তাঁহারা সেই উপযুক্তও মনে করেন না। কেননা, তাঁহারা নিজেদের সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া রাখেন। বিলুপ্ত সত্তা মতামত স্থির করিতে পারেন কিরূপে? তাঁহাদের কোন আত্মীয়-স্বজন রুগ্ন হইলে যাঁহারা ঔষধও করেন এবং দো'আও করেন। কিন্তু অন্তরে উভয় অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, মৃত্যু ঘটিলে ইহার উপর তো পূর্ব হইতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক দুঃখ হইলে কোন ক্ষতি নাই। অন্তরে তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্টই থাকেন। বস্তুত যাবতীয় দুঃখের মূল—এই মতামত স্থির করা এবং আশা করাই বটে। যে ব্যক্তি মতামত ও আশাকে বিলোপ করিতে পারে, সে সকল অবস্থায় শান্তিতে ও আরামেই থাকে; বরং কোন দুনিয়াদার লোক যদি কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক হইতে অপূর্ণ সামঞ্জস্যও লাভ করিতে পারে, সেও অপর দুনিয়াদারগণ অপেক্ষা অধিক শান্তিতে থাকে।

এক মোল্লা ধরনের জেণ্টল্‌ম্যান ছিলেন, অর্থাৎ, স্বাধীন দুনিয়াদার। তিনি হ্যাটও পরিতেন, তৎসঙ্গে লুঙ্গিও পরিতেন। মানুষ হাসিত, হ্যাট আর লুঙ্গিতে কি সম্পর্ক! তিনি উত্তর করিতেনঃ "পোশাক শান্তির জন্য পরা হয়, প্যাণ্টে আরাম নাই; বরং ইহা মানুষকে আঁট-সাঁট করিয়া বাঁধিয়া রাখে। অতএব, উহা ত্যাগ করিয়া লুঙ্গি পরিয়াছি। আর হ্যাট পরিধানে শান্তি আছে। ইহাতে রৌদ্র প্রভৃতি হইতে চক্ষুর হেফাযত হইয়া থাকে। অতএব, আমি আরামের বস্তু অবলম্বন করিয়াছি, সামঞ্জস্য থাকুক বা না থাকুক।" তাঁহার পিতার মৃত্যুর টেলিগ্রাম আসিলে বাবুর্চি খানা পাকাইল না।

আজ সাহেব খানা খাইবেন না। সময়মত তিনি খানা তলব করিলে সে বলিলঃ আজ পিতৃবিয়োগের শোকে আপনি খানা খাইবেন না ধারণা করিয়া আমি খানা পাকাই নাই। সাহেব তাহার পাঁচ টাকা জরিমানা করিলেন (ইহা ছিল পাগলামি) এবং বলিলেনঃ সোব্‌হানাল্লাহ্! তিনি নিজের নির্দিষ্ট সময়ে এন্তেকাল করিয়াছেন, আর তুমি আমাকে জীবিত অবস্থায় ক্ষুধার্ত রাখিয়া মারিতে চাহিতেছ? (ইহা বিবেচনাপ্রসূত কথা বটে; ইহাই প্রকৃত স্বাধীনতা। ইহাতে সম্পূর্ণ শান্তিই শান্তি।)

বন্ধুগণ! ধর্মপরায়ণ লোকেরাই প্রকৃত দুনিয়াদার। দুনিয়ার প্রাণবস্তু অর্থাৎ, প্রাণের শান্তি তাঁহাদেরই নিকট রহিয়াছে। দুনিয়াদারদের নিকট সাজ-সজ্জার বাহার ছাড়া শান্তির কিছুই নাই। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ শান্তি ভোগ করিয়াও থাকেন, তবে তাহা শুধু আল্লাহ্ওয়ালা লোকের সদৃশতাবশত ভোগ করেন। ফলকথা, দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ চিন্তা করাই দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগিতা উৎপন্ন করার উপায়।

**আখেরাতের সহিত মনোযোগ স্থাপনের উপায়ঃ** এখন আখেরাতের সহিত মনোযোগ স্থাপনের উপায় শ্রবণ করুন। তাহা এই যে, আখেরাতের অবস্থাসমূহ চিন্তা করুন। আখেরাতের প্রথম অবস্থাঃ তাহাতে দুঃখ-চিন্তার নাম-গন্ধও নাই। বলাবাহুল্য, দুনিয়াতেই যখন আখেরাত তলব করার এই ফল, অর্থাৎ, আখেরাত প্রত্যাশী এখানেও অন্তরের শান্তি লাভ করিয়া থাকে; তখন আখেরাতে পৌঁছিয়া তাঁহাদের কেমন শান্তিময় অবস্থা হইবে! দ্বিতীয় অবস্থাঃ আখেরাত অনন্তকাল স্থায়ী। উহার নেয়ামতসমূহ অফুরন্ত ও অনন্ত। তৃতীয় অবস্থাঃ উহা যতটুকু কামনা করা হয়, তদপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়; বরং যতটুকু তোমরা কামনা করিতেও পার না, তাহাও পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে দুনিয়া কাম্য পরিমাণও পাওয়া যায় নাঃ

مَاقَضٰى اَحَدٌ مِّنْهَا لُبَانَتَهٗ ـ لَايَنْتَهِىْ اِرْبٌ اِلَّا اِلٰى اِرْبٍ

ইহা দৃষ্ট বিষয় এবং সকলেই জানে যে, কোন মানুষই দুনিয়া প্রত্যাশিত পরিমাণ পায় না। অথচ আখেরাতের অন্বেষণকারী সমুদয় কাম্যই লাভ করে। সে শান্তি কামনা করে, বেহেশ্‌তের প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি তলব করে। বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাৎলাভের আশা রাখে। অনেক কিছু সে দুনিয়াতেও পাইয়া থাকে। যেমন, মনের শান্তি এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ। অবশ্য দুনিয়াতে যাহাকিছু পাওয়া যায়, তাহা পরিবর্তনের আশঙ্কাও সর্বদা মনে লাগা থাকে। অথচ আখেরাতে সে চিন্তা নাই। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

"যে ব্যক্তি আশু জীবন অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রত্যাশী, আমি যত পরিমাণ ইচ্ছা এবং যাহাকে ইচ্ছা এখানেই দান করিয়া থাকি। অতঃপর তাহার জন্য দোযখ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যাহাতে সে লজ্জা ও অপমানের সহিত প্রবেশ করিবে।" সেই ব্যক্তি পাকা দুনিয়াদার, যাহার প্রত্যাশা কেবল দুনিয়া, অর্থাৎ কাফের। যাহারা আখেরাত চিনেই না, দুনিয়া লইয়াই ব্যস্ত। তাহারাও দুনিয়া যত চায় তত পায় না। আবার তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক প্রত্যাশীও পায় না। অতঃপর বলেনঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

“আর যে ব্যক্তি আখেরাতের প্রত্যাশা করে এবং উহার জন্য যথোপযোগী চেষ্টা করে।” এখানে سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا “উহার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করে” বাক্যাংশকে أَرَادَ الْاٰخِرَةَ “আখেরাতের প্রত্যাশা করে” বাক্যের ব্যাখ্যারূপে সংযোগ করা হইয়াছে যাহাতে প্রত্যাশীদের প্রত্যাশারোধ করা যায়। কেননা অনেকে আখেরাতের প্রত্যাশা বলিতে শুধু মুখে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করে যে, “আমি আখেরাত তলবের নিয়ত করিতেছি।” আল্লাহু আকবার! অর্থাৎ, অনেকে শুধু আখেরাতের আকাঙ্ক্ষাকেই তলবে-আখেরাত মনে করিয়া থাকে। উহার কোন আসবাব বা উপকরণ অবলম্বন করে না। কেবল আখেরাতের বেলায়ই এই অবস্থা। দুনিয়ার সহিত এরূপ ব্যবহার কেহই করে না যে, কেবল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। এই জন্যই مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ -এর সঙ্গে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا বলেন নাই। কেননা, দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করার অর্থই সাধারণত এই যে, উহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। এখন এরূপ সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে, আখেরাতের ক্ষেত্রে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا যোগ করা হইয়াছে, দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাহা করা হইল না কেন? ইহাতে দুনিয়ার উপর আখেরাতের শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণরূপে বুঝা গেল না। আখেরাতের বেলায়ও যদি শুধু প্রত্যাশা পর্যন্তই থাকিত, তবে বিরোধিতা পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হইত। সন্দেহ ভঞ্জনের সারমর্ম এই যে, سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য। কিন্তু দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সেস্থলে মানুষ প্রত্যাশার অর্থে ভুল করে না।

আখেরাতের ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক ভুল করিতে দেখা যাইতেছে, কাজেই وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا যোগ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। আর سَعٰى لَهَا سَعْيَهُ না বলিয়া سَعْيَهَا বলার তাৎপর্য এই যে, وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -এর অর্থ “এবং আখেরাতের জন্য আখেরাতের উপযোগী চেষ্টা করে।” আর سَعْيَهُ বলিলে অর্থ হইত, “এবং আখেরাতের জন্য নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে।” কাজেই سَعْيَهُ বলিলে দুর্বলমতি লোকেরা সুযোগ পাইত। সামান্য কিছু কাজ করিয়াই বলিয়া দিত, “আমার সাধ্য এপর্যন্তই।” অতএব, তাহাদের এই টালবাহানার পথ বন্ধ করার জন্যই বলিয়াছেনঃ “আখেরাতের জন্য আখেরাতের উপযোগী চেষ্টা করে।” ইহার অর্থ সাধ্যের বাহিরে চেষ্টা করাও নহে। যেমন, আখেরাতের মহান মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলে বাহ্যত তাহাই বুঝা যায়; বরং উদ্দেশ্য ইহাই যে, নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিবে।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেনঃ ”فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ “তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌কে ভয় কর।” অতএব, سَعْيَهَا এবং سَعْيَهُ -এর সারমর্ম একই, কিন্তু سَعٰى لَهَا سَعْيَهُ -এর পরে سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -এর অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, “নিজের সাধ্যানুরূপ চেষ্টা শেষ করিয়া দিবে।” এরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে দুর্বলমতি লোকেরা বাহানা করিবার সুযোগ পাইত। খুব অনুধাবন করুন।

এই হেকমতের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ -কে প্রথম নাযিল করেন নাই; বরং প্রথমে নাযিল করিয়াছেনঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ অর্থাৎ, “ভয়ের হক আদায় করিয়া আল্লাহ্‌কে ভয় কর।” ইহা শুনিয়া ছাহাবায়ে কেরাম ঘাবড়াইয়া গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ‘শান্’ অনুযায়ী ভয় করা কাহার দ্বারা সম্ভব? তখন তাঁহাদের সান্ত্বনার জন্য فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ নাযিল করিয়াছেন। এই বাক্যের দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম রহিত হইয়া যায় নাই; বরং ইহা দ্বারা উহার তফসীর করা হইয়াছে। অর্থাৎ, فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ -এর অর্থ এই যে, নিজেদের

সাধ্য অনুযায়ী পরহেয্‌গারী অবলম্বন কর। পূর্বকালের তফ্‌সীরকারকদের মধ্যে কেহ مَااسْتَطَعْتُمْ কে حَقَّ تُقَاتِه -এর হুকুম রহিতকারী বলিয়া থাকিলেও উদ্দেশ্য তফ্‌সীরই বটে। কেননা, পুরাতন যুগের তফ্‌সীরকারকদের কথায় পূর্ববর্তী হুকুমের পরিবর্তন এবং ব্যাখ্যা উভয়কেই 'রহিতকরণ' বলা হইয়া থাকে। যাহাহউক, সাধ্যানুরূপ 'তাক্‌ওয়া' অবলম্বনই উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাকে فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه -এর পরে উহারই ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণনা করার ফলে দুর্বলমতি লোকদের টালবাহানা বন্ধ হইয়া গেল। আর প্রথমেই فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ নাযিল হইলে দুর্বল ঈমান লোকদের বাহানা করার সুযোগ থাকিয়া যাইত। এইরূপে এখানেও মনে করুন, سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا -কে فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ -এর সাথে মিলাইয়া দেখিলে সারমর্ম এই দাঁড়ায়, "নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা কর।" কিন্তু سَعٰى لَهَا سَعْيَهٗ প্রথমে না বলার হেকমত এইমাত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাতে দুর্বলমতি লোকেরা টালবাহানা করার সুযোগ পাইত। والله اعلم باسرار كلامه (ইহার গূঢ় রহস্য আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।)

যাহাহউক, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যাহারা আখেরাত অন্বেষণ করে এবং উহার জন্য যথোপযোগী চেষ্টা করে, اُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا "তাহাদের চেষ্টার মূল্য প্রদান করা হইবে।" প্রকাশ্যে এখানে নির্দিষ্ট পুরস্কারের উল্লেখ নাই। কিন্তু কোরআন বিশ্ব-অধিপতির কালাম, ইহাতে শাহী ভাব-ধরনের কথাবার্তা বলা হয় এবং শাহী ভাষায়—"তাহার চেষ্টার মূল্য দেওয়া হইবে" কথাটি খুব বড় কথা। ইহা হাজার হাজার তফ্‌সীল হইতেও অগ্রণী। বাদশাহ্ যদি বলেনঃ আমি তোমার খেদমতের মূল্য উপলব্ধি করিয়াছি, তখন তাহার বুঝা উচিত, অনেক কিছুই পাওয়া যাইবে এবং আশার অতিরিক্তই পাওয়া যাইবে। এখন বুঝিয়া লউন, যাহার চেষ্টার মূল্য আহ্‌কামুল হাকেমীন দান করিবেন, সে কি পরিমাণ লাভ করিবে?

এইরূপে কোরআনে যে জায়গায় لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ইত্যাদি আছে, ইহাও শাহী বাক্‌পদ্ধতি। বাদশাহ্‌দের রীতি, তাঁহারা এই জাতীয় শব্দেই ওয়াদা করিয়া থাকেন। 'আশান্বিত থাক,' শাহী কালামে এই শ্রেণীর ওয়াদা অপরের কথার 'কসম' হইতেও অধিকতর দৃঢ়। সুতরাং আখেরাতের অন্বেষণে আগ্রহ করার উপযোগী এই একটি বিষয় আছে যে, আখেরাতের অন্বেষণ কখনও বিফলে যায় না; বরং ফল অবশ্যই লাভ হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়ার বেলায় এমন কোন ওয়াদা নাই।

আর একটি কথা এই যে, আখেরাতের প্রত্যাশী আশার অতিরিক্ত পাইয়া থাকে। যেমন, একটি নেক আমলের ১০ গুণ সওয়াব প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত রহিয়াছেঃ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا আবার কেহ সাত শত গুণও প্রাপ্ত হইবে। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত আছেঃ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ○

"এক একটি নেক আমল একটি বীজের ন্যায়, যাহা হইতে সাতটি ছড়া উৎপন্ন হয়, প্রত্যেকটি ছড়ায় ১০০টি করিয়া দানা।" ইহার উপরেই শেষ করেন নাই; বরং অন্যত্র বলিয়াছেন— فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً "তাহাকে বহুগুণ দান করিবেন।" এখন তো আর কোন সীমাই নির্ধারণ করা হইল না। পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হুযূর (দঃ) যখন দো'আ করিলেন— اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ "হে খোদা! আমাকে আরও বেশী সওয়াব দান করুন।" তখন فَيُضَاعِفَهٗ الاٰية নাযিল হইয়াছে। (বহু হাদীসের কিতাবের বরাতে তফসীরে মায্‌হারীতে এরূপ আছে।) অতএব, নিশ্চিতরূপে সাত শত গুণ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। তফসীরকারকগণ

প্রত্যেক গুণের মান সাত শত বলিয়াছেন। তাহা যদি নাও হয়, তথাপি অনেক বেশী হওয়াতে তো কোনই সন্দেহ নাই। কেননা, তাহা কোরআনেই উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ আল্লাহ্‌র রাস্তায় একটি খোরমা দান করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা এত অধিক বাড়াইয়া থাকেন যে, ওহুদ পর্বত হইতে বড় হইয়া যায়। এই হাদীস অনুসারে তো সওয়াবের মাত্রা আরও অনেক বাড়িয়া যায়। কেননা, ওহুদ পাহাড়কে খোরমার পরিমাণ খণ্ডে পরিণত করিতে হইলে দুই শত বৎসরেরও অধিক সময় লাগিবে। অর্থাৎ, বেহিসাব বা অগণিত-অসংখ্য সওয়াব পাওয়া যাইবে। কোন কোন মূর্খ লোক ইহা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছে।

এক মূর্খ আর্য লিখিয়াছেঃ মুসলমানদের সওয়াবের যে ধারা বর্ণিত আছে তাহা ঠিক নহে। কেননা, আমাদের আমল সসীম, ইহার সওয়াব অপরিসীম হওয়ার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক পোয়া খাদ্য গ্রহণকারীকে ৫০ মণ খাওয়াইয়া দেওয়া। সে তো ইহাতে মরিয়াই যাইবে। সসীমের মধ্যে অসীম সওয়াব লাভের শক্তি কোথায়? এই মূর্খতাপূর্ণ উক্তির উত্তর একেবারে পরিষ্কার। এক পোয়া পরিমাণ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে যদি ৫০ মণ খাদ্য একই সময়ে একেবারে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবেই সে মরিবে। কিন্তু যদি অসীম সওয়াব প্রদানের সাথে সাথে আয়ুষ্কালও সীমাহীন করিয়া দেওয়া হয় এবং অসীম আয়ুষ্কালে অনন্ত ও অফুরন্ত খাদ্য ক্রমে ক্রমে খাওয়ান হয় তাহাতে জটিলতা কিসের? উক্ত মূর্খ আর্য সওয়াবকে ধরিয়া লইয়াছে অসীম আর আয়ুকে ধরিয়াছে সীমাবদ্ধ। কাজেই বৃথা প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে, মুসলমানরা পরলোকের আয়ুকে অসীম এবং অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু মূর্খ আর্যগণ অনন্তকালের জন্য 'নাজাত্‌' স্বীকার করে না। তাহাদের মতে পুণ্যবান ব্যক্তি আত্মার জগতে এক নির্দিষ্টকাল অবস্থানের পর অবতাররূপে কোন দেহ ধারণপূর্বক জগতে নামিয়া আসে। কাজেই সে কর্মফল লাভের মুদ্দতকে সীমাবদ্ধ বলিয়া ধারণা করিয়া এই উদ্ভট সন্দেহ করিয়া বসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সন্দেহযোগ্য বিষয়ই নহে। গোঁড়ামি, পক্ষপাতিত্ব দোষে জ্ঞান-বুদ্ধি বিকল মস্তিষ্কে যাহা আসিয়াছে, বলিয়া দিয়াছে। আখেরাতে নেক আমলের সওয়াব অগণিত ও অসংখ্য পাওয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া মূর্খেরা ঘাবড়াইয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে তথাকার অবস্থা এইরূপঃ

نیم جاں بستاند و صد جاں دهد    آنچه در وهمت نیاید آں دهد
خود که باید ایں چنیں بازار را    که بیك گل می خری گلزار را

"অর্ধেক প্রাণের বিনিময়ে শত শত প্রাণ বখ্‌শিশ্‌ করিয়া থাকেন। কল্পনার বাহিরে অতিরিক্ত দান করেন। এমন বাজার কোথায় আছে যেখানে একটি ফুলের বিনিময়ে পূর্ণ ফুলের বাগানই খরিদ করা যায়?"

অতএব, তাঁহার পক্ষ হইতে যখন এমনভাবে প্রাণ বখ্‌শিশের ব্যবহার, তখন আমাদেরও তাঁহার সহিত প্রাণদানের ব্যবহার রাখা উচিতঃ

همچوں اسماعیل پیشش سر بنه    شاد و خنداں پیش تیغش جاں بده

"ইসমাঈ'লের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে মাথা নত কর। তাঁহার তরবারির সম্মুখে হাসি-খুশীর সহিত প্রাণ দাও।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছেঃ বেহেশ্‌তে সকলের শেষে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে বলিবেনঃ 'যা, বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।' সে বেহেশতে প্রবেশ করিয়া দেখিবে ভীড় ও হট্টগোল। আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করিবেঃ "এখানে তো জায়গা নাই।" আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিবেনঃ "তোকে আমি দুনিয়ার চেয়ে দশ গুণ অধিক পরিমিত স্থান বেহেশ্‌ত দান করিয়াছি।" সে বলিবে, اَتَسْتَهْزِءُ بِىْ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ "আপনি রাব্বুল আলামীন হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?" এখানে তো একটুও জায়গা নাই। আর আপনি বলেনঃ "দুনিয়ার চেয়ে দশ গুণ বেশী।" এই বেহেশ্‌তী মূর্খ ও গেঁয়ো, কাজেই এমন নির্ভীকভাবে কথাবার্তা বলিবে। বেহেশ্‌তে মূর্খ লোকও যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নুল মোবারক নামাযের পরে নামাযীদিগকে মসজিদ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেনঃ আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, ইহারা সকলে বেহেশ্‌তের 'ভর্তি।' কিন্তু কাজের লোক ইহাদের মধ্যে দুই তিন জনই হইবে। ভর্তি শব্দের অর্থ অতিরিক্ত বোঝা।

**বেহেশ্‌ত ও দোযখের বিস্তৃতিঃ** বন্ধুগণ! আপনারা বেহেশ্‌তের প্রত্যাশী। বেহেশ্‌ত ইনশাআল্লাহ্‌ আপনারা পাইবেনই। বেহেশ্‌ত আপনাদেরই জন্য—কাফেরদের জন্য কখনই নহে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। কেবল একটু কাজ করুন। মন্দ কার্যগুলি ছাড়িয়া দিন। কিন্তু আমার মনে আকাঙ্ক্ষা, আপনারা বেহেশ্‌তের 'ভর্তি' অর্থাৎ, অকেজো হইবেন না; বরং কাজের লোক হউন। এরূপ হইলে বেহেশ্‌তে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের মুসলমানদের জন্যও দুনিয়ার দশ গুণ পরিমিত স্থান দেওয়া হইবে।

কোন এক নাস্তিক প্রশ্ন করিয়াছিলঃ "আমরা এত ভূগোল পাঠ করিলাম, কোথাও তো বেহেশ্‌তের সন্ধান পাইলাম না।" উত্তরে আমি বলিয়াছিলামঃ "তুমি দৃশ্য জগতের ভূগোল পড়িয়াছ, অদৃশ্য জগতের ভূগোল পড় নাই। তাহা আমাদের নিকট আছে। তুমি যদি উভয় জগতের ভূগোল অর্থাৎ, কোরআন পড়িতে, তবে বেহেশ্‌তের সন্ধান পাইতে। যাঁহারা এই ভূগোল পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বেহেশ্‌ত, দোযখ, পুলছেরাত, আরশ এবং মীযানের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐসমস্ত বস্তু দুনিয়াতেই খোলাখুলিভাবে দেখিতে পাইয়াছেন।"

শেখ আবদুল করীম জায়লী (রঃ) দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বেহেশ্‌ত এবং দোযখের জরিপ পর্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেননা, উভয় বস্তুই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি সত্ত্বেও সীমাবদ্ধই বটে। সীমাবদ্ধ বস্তুর জরিপ করা অসম্ভব কিছুই নহে। কিন্তু দেহের ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতির সাহায্যে জরিপ করিতে হইলে তবুও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত। তিনি যখন আত্মিক শক্তির সাহায্যে জরিপ করিয়াছেন, কাজেই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। কেননা, আত্মার ক্ষমতা অনেক বেশী। এতদ্ভিন্ন হযরত শেখ আবদুল করীম জায়লী (রঃ) দিব্য চক্ষুর সাহায্যে এক মহাসমুদ্রও দেখিতে পাইয়াছেন। উহার এক এক তরঙ্গ আসমান-যমীন অপেক্ষা দশ গুণ বড়। কিন্তু ফেরেশ্‌তারা সেই তরঙ্গরাজিকে রুখিয়া রাখিয়াছেন। অন্যথায় আসমান-যমীন সবকিছুই ডুবিয়া যাইত।

আবার কোন কোন মূর্খ এরূপ সন্দেহ করিয়াছে যে, বেহেশ্‌ত যখন এত বিশাল ও বিরাট, عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ "উহার পরিসর সমস্ত আসমান ও যমীনের সমপরিমাণ," তখন উহা কোথায় রাখা হইয়াছে?" তদুত্তরে আমি বলিঃ এই প্রশ্ন করিবার অধিকার কাহারও নাই। কেননা, তোমাদের বৈজ্ঞানিকদের মতে শূন্যমণ্ডল অসীম; সুতরাং অসীম শূন্যমণ্ডলের কোথাও বেহেশ্‌ত

অবস্থিত থাকিলে ক্ষতি কি? মঙ্গল গ্রহে তোমরা যেমন জনবসতি রহিয়াছে বলিয়া মনে কর, তদ্রূপ হয়তো কোন স্থানে জনবসতিপূর্ণ বেহেশ্‌তও গ্রহের মত বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অত্যধিক দূরত্বের কারণে তাহা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। মঙ্গল গ্রহের অবস্থিতি পৃথিবীর নিকটবর্তী বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস। কাজেই তোমরা তথাকার জনবসতি সম্বন্ধে জানিতে পারিতেছ। বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদিগকে নিরুত্তর করার উদ্দেশ্যে এই উত্তর দেওয়া হইল। অন্যথায় আমাদের মতে আসমান-যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যমণ্ডলের বাহিরে সাত আসমানের উপরে বেহেশ্‌ত অবস্থিত। কোরআনের সাহায্যে জানা যাইতেছে যে, বেহেশ্‌ত আসমানসমূহের উপর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط

“উষ্ট্র সূচের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কাফেরদের জন্য আসমানের দ্বারও খোলা হইবে না, তাহারা বেহেশ্‌তেও প্রবেশ করিতে পারিবে না।”

আর হাদীস হইতে জানা যায় যে, বেহেশ্‌ত সাত আসমানের উপরে এবং আরশের নীচে। আরশ্ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহার চেয়ে বড় কোন সৃষ্টিই নাই। আবদুল করীম জায়লী (রঃ) দিব্য চক্ষে যে সমুদ্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহার তরঙ্গ আসমান-যমীন অপেক্ষা দশ গুণ বড় ছিল, তাহাও আরশেরই নীচে অবস্থিত বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। আরশ যদিও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সৃষ্টি, তথাপি তাহাও সীমাবদ্ধ। কেবল আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তারই কোন সীমা নাই। একমাত্র তিনিই অসীম।

যাহারা আরশকে আল্লাহ্ তা'আলার বাসস্থান মনে করে এবং বলে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আমরা যেমন ঘরে বাস করি, আল্লাহ্ তা'আলাও তেমনি আরশে অবস্থান করিতেছেন, উপরিউক্ত বর্ণনায় তাহাদের এই উক্তি প্রকাশ্য ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইল। কেননা, সসীম পদার্থ অসীমকে কোন মতেই বেষ্টন করিতে পারে না। অথচ বাসস্থান বাসিন্দাকে বেষ্টন করিয়া থাকা অনিবার্য।

এখন একটি কথা অব্যক্ত থাকিয়া যায়, তবে اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থ কি? সহজ কথায় এই প্রশ্নের উত্তর প্রাচীনকালের ওলামায়ে কেরাম এই দিয়াছেন যে, এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত, “আমরা ইহার অর্থ জানি না।”

অর্থ যাহাই হউক, ইহার উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের জন্য ফরয। যদি কেহ ব্যাখ্যা বুঝিতে চান, তবে ইহার ব্যাখ্যাও সহজ। আমি বার বার বর্ণনা করিয়াছি, اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ 'শাহী উক্তি', যেমন, ফারসী ভাষায় বলা হয়, 'তখ্‌ত নেশীনী' অর্থাৎ, সিংহাসনারোহণ। এখানে তখ্‌ত বলিতে রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ এবং আদেশ-নিষেধ প্রবর্তন। অন্যথায় তখ্‌ত-এর অর্থ কুরসী বলা হইলে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কেননা, কোন কোন বাদশাহ্ কুরসীতে না বসিয়া বিছানার উপর বসিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। আর আজকাল কুরসী বলিতে সিংহাসন মোটেই বুঝাইবে না। কেননা, ষ্টলে এবং সেলুনে রাজকীয় ধরনের কুরসী ব্যবহৃত হইতেছে। তথাপি সিংহাসনারোহণ শব্দটি আজকালও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, সিংহাসনারোহণ বলিতে আজকাল যে অর্থ বুঝায়, অর্থাৎ, রাজ্য পরিচালনায় ক্ষমতার প্রয়োগ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থও তাহাই বটে। কোন কোন স্থানে اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর সঙ্গেই يُدَبِّرُ الْاَمْرَ বলা হইয়াছে। ইহাতে একথার পোষকতা পাওয়া যায় যে, اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ -এর অর্থ শাসন, সংরক্ষণ এবং আদেশ-নিষেধ জারি করা।

বেহেশ্‌তের এত পরিসরতা দেখিয়া যদি কেহ সন্দেহ করে যে, এমন সুবিশাল বেহেশ্‌তে কেমন করিয়া থাকা যাইবে ? ভয় করিবে না কি ? তবে তদুত্তরে বলা হইবে—তথায় চাকর-নওকর এবং আয়েশ-আরামের সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তাহাতে বেহেশ্‌ত সরগরম থাকিবে। এই সমস্তের কারণে মন বসিয়া যাইবে।

যাহাহউক, বেহেশ্‌তের এসকল অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করুন। ইহাতে আখেরাতের প্রত্যাশা এবং তৎপ্রতি মনোযোগ উৎপন্ন হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সামান্য পরিশ্রমের বিনিময়ে এমন বিরাট বেহেশ্‌ত দান করিবেন। অথচ দুনিয়ার প্রত্যাশার বিনিময়ে কোনই ওয়াদা নাই। এখানে কোন তালেবে এল্‌ম হয়তো প্রশ্ন করিবে, এক আয়াতে তো দুনিয়ার প্রত্যাশার বিনিময়ে ফল প্রদানের ওয়াদা আছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا

“যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি কামনা করে, আমি তাহার কৃষিতে বরকত দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কৃষি প্রত্যাশা করে, তাহাকেও আমি উহা হইতে দান করি।” ইহার উত্তর এই—এখানে দুনিয়ার প্রত্যাশার বিনিময়ে যে ফল প্রদানের ওয়াদা রহিয়াছে, তাহাতে مِنْهَا শব্দ যুক্ত আছে। এখানে مِنْ অব্যয়টির অর্থ 'আংশিক।' কাজেই দুনিয়ার সকল প্রত্যাশার বিনিময় প্রদানের ওয়াদা হইল না। অন্যত্র এক আয়াতে অবশ্য আখেরাতের প্রত্যাশার সঙ্গেও مِنْهَا শব্দ যুক্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে—

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ

কিন্তু সেক্ষেত্রে من অব্যয়টি আংশিক অর্থে নহে; বরং স্থানীয় সঙ্কেতে বুঝা যায়, من 'আরম্ভ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, তাহাদের সওয়াব আখেরাত হইতেই আরম্ভ হইবে। কোরআন ও হাদীসের মর্ম বুঝিবার জন্য আরবী ব্যাকরণে বিশেষ দক্ষতা থাকার প্রয়োজন। শুধু শাব্দিক অর্থ পড়িয়া বুঝা যায় না।

**আজকাল প্রত্যেক মূর্খই মুজ্‌তাহিদ্ঃ** কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! আজকাল আরবী ব্যাকরণের জ্ঞানলাভ ব্যতীতই অনেকে কোরআন-হাদীস বুঝিতে চাহেন। নূতন নূতন মুজ্‌তাহিদগণ প্রাথমিক দুই-চারিটি কিতাব পড়িয়া মেশ্‌কাত এবং বোখারী শরীফের অনুবাদ আরম্ভ করেন এবং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেঈ ছাহেবের উপর প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। যেমন, এক মূর্খ বলিয়াছেঃ হাদীসে তো আসিয়াছে 'খেদাজুন' 'খেদাজুন', অথচ হানাফী মতাবলম্বীরা বলেঃ নামাযে সূরা-ফাতেহা পড়া ফরয নহে। বাস্তবিক ইহা এক বিচিত্র যমানা। এখন প্রত্যেক মূর্খই মুজ্‌তাহিদ। কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। আজকাল মুসলমান তো মুসলমানই, ইংরেজরাও ইসলামের মধ্যে এজ্‌তেহাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রামপুরের এক ইংরেজ মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলঃ কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, প্লেগ রোগ ছোঁয়াচে। কোরআনে উল্লেখ আছে—কোন স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে সেই স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। ইহার সঙ্গে একটি কথা সে নিজের তরফ হইতে লাগাইয়া দিলঃ “যাইতে নিষেধ করার কারণ এই যে, তাহাতে প্লেগ বিস্তার লাভ করে।” এই জন্যই নিষেধ করিয়াছেন, যেন এক স্থানের প্লেগ অন্যস্থানে ছড়াইতে না পারে। ব্যাস্! দাবী প্রমাণিত হইয়া গেল। অতএব, এই ইংরেজও ইসলাম ধর্মের মুজ্‌তাহিদ হওয়ার দাবীদার ছিল। কাজেই নিজের তরফ হইতে একটি বাক্য যোগ করিয়া দিয়াছে।

ইহার চেয়ে আরও মারাত্মক হইল, হিন্দুরাও ইসলামের মুজ্‌তাহিদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে জনৈক হিন্দু সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রচারিত হইয়াছিল যে, সে জেলখানায় কোরআন পাঠ করিতেছে। উদ্দেশ্য, মুসলমানদের জন্য কর্মপন্থা স্থির করিবে। অতঃপর সে জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই ফতওয়া জারি করিল যে, কোরআনের কোথাও গাভী যবেহ্ করার নির্দেশ দেখিলাম না। সুতরাং মুসলমান এই কার্য বর্জন করুন। অতএব আজকাল কোন মূর্খ মুসলমানও যদি মুজ্‌তাহিদ হইয়া বসে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু এসমস্ত মূর্খতার কারণে ইন্‌শাআল্লাহ্ ইসলামের কোন ক্ষতি হইতে পারে না—

اگر گیتی سراسر باد گیرد ۔ چراغ مقبلاں ہرگز نہ میرد

"সমগ্র ভূমণ্ডল একেবারে বায়ুতে পরিণত হইলেও খোদার প্রিয় বান্দাগণের চেরাগ নিভিবে না।" কবি আরও বলেন ঃ

چراغے را کہ ایزد بر فروزد ۔ ہر آنکس تف زند ریشش بسوزد

"খোদার জ্বালান প্রদীপ কেহ নিভাইতে পারে না; বরং উহা ফুৎকার প্রদানকারীর দাড়ি জ্বালাইয়া দেয়।" এই ইস্‌লাম ধর্ম মানুষের আয়ত্তে হইলে বহুপূর্বে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কেননা, মূর্খ এমন কি কাফেরেরাও মুজ্‌তাহিদ্ হওয়ার দাবী করিতেছে। কিন্তু আল্লাহ্ ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ "আমি কোরআন নাযিল করিয়াছি, আমিই ইহার হেফাযত করিব।" এই কারণেই মুসলমান ধর্ম প্রচারের বিষয়ে মোটেই চিন্তা করে না। আল্লাহ্ তা'আলা যেন ইহার কন্ট্রাক্ট লইয়াছেন। অতএব, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর দায়িত্ব চাপাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এত নিশ্চিন্ত থাকা ভাল নহে। ইহাতে ধর্মের কোনই ক্ষতি নাই, বরং আমাদেরই ক্ষতি। কেননা, আমরা ধর্মের খেদমতকারীদের তালিকা হইতে খারিজ হইয়া যাইব। অতএব, এত চিন্তিত হওয়ারও প্রয়োজন নাই, যেরূপ জাতির হিতাকাঙ্ক্ষিগণ গায়কের ন্যায় ধর্মের গল্প গাহিয়া ফিরিতেছে।

**ধর্ম প্রচারের নিয়ম ঃ** আমি দেওবন্দ মাদ্রাসায় একবার ওয়ায করিয়াছিলাম। উক্ত ওয়াযের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'তব্‌লীগের নিয়ম।' উক্ত ওয়াযগ্রন্থ পাঠ করিলে এবিষয়ে বিশেষ উপকার হইবে। উহাতে আমি বলিয়াছি ঃ ধর্ম প্রচারে চিন্তার কোন্ স্তর কাম্য এবং কোন্ স্তর কাম্য নহে। তন্মধ্যে একটি বিষয় এই যে, তব্‌লীগের পর উহাতে ফল হইল কিনা তাহার অপেক্ষা করিও না। অর্থাৎ, এমন স্থির করিয়া লইও না যে, আমার প্রচারে শুদ্ধি আন্দোলন বন্ধ হইয়া যাইবে, কিংবা দশ হাজার হিন্দু মুসলমান হইয়া যাইবে। কেননা, এরূপ সিদ্ধান্ত করায় ও ইহার অপেক্ষা করায় ফল এই হয়—কিছুদিন পরে প্রচারের ফল ফলিতে বিলম্ব হইলে প্রচারকের সাহস এবং উৎসাহ্ কমিয়া যায়। ইহার রহস্য এই যে, প্রথমে কাজের গতিবেগ প্রখর হইলে অচিরেই মন্থর হইয়া যায়।

সূফিয়ায়ে কেরাম এই বিষয়টি উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যেক্ষেত্রে কাজ অধিক করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেখানে প্রকৃতপক্ষে কাজ অধিক করিতে নিষেধ করেন নাই; বরং আমল কম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা, এই অতিরিক্ত কাজের পরিণাম হয় কাজ কম হওয়া। তবে সূফিয়ায়ে কেরামের কেহ কেহ অতিরিক্ত কাজ এবং অত্যধিক

পরিশ্রম করিতেন বলিয়া যাহা দেখা যায়—ইহার রহস্য এই যে, নেক আমল তাঁহাদের স্বভাবে এবং খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। কাজেই তাঁহাদের অতিরিক্ত আমল ক্লান্তি এবং পরিণামে আমল হ্রাস পাওয়ার কারণ হইত না।

এই কারণে যখন কোন নীরস দরবেশ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, এত অধিক পরিশ্রম করা নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া নহে কি? আল্লাহ্ لَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ "তোমরা নিজদিগকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করিও না" আয়াতে তাহা নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা জবাব দিয়াছেনঃ প্রত্যেকের ধ্বংস পৃথক। অতিরিক্ত কাজ করা যাহার জন্য ধ্বংসের কারণ, সে অতিরিক্ত কাজ করা ত্যাগ করুক। যাহার জন্য কাজ কমাইয়া দেওয়া ধ্বংসের কারণ, সে কাজ কম করা ত্যাগ করুক। আমাদের জন্য কাজ কম করাই ধ্বংসের কারণ। সুতরাং অতিরিক্ত এবাদত করিতে আমাদের জন্য নিষেধ নাই।

ফলকথা, ফলের অপেক্ষা করা ক্ষতিকর। ইহাতে কিছুদিনের মধ্যেই কাজের উৎসাহ্ ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই এমন কোন চিন্তা থাকা উচিত নহে, সর্বদা যাহার জন্য চিন্তিত থাকিতে হয় এবং ফলের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। সুতরাং, এত চিন্তাও হিতকর নহে। আবার নিশ্চিন্ত থাকাও ভাল নহে। যেমন, আজকাল আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বস্! তোমরা এতটুকুই কর যে, নিজের তরফ হইতে তবলীগের চেষ্টা করিতে থাক এবং ফলের আশা রাখ। কিন্তু উহা ফলিবার প্রতীক্ষায় থাকিও না; বরং সেই ব্যাপার খোদার উপর সোপর্দ করিয়া দাও।

আমি বলিতেছিলাম—আজকাল ইস্‌লাম ধর্মে প্রত্যেকে এজ্‌তেহাদের দাবী করিতেছে। ইহাও এই যমানার একটি বিশেষত্ব। অনুপযুক্ত লোক নিজের গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যোগ্য লোকের স্থান অধিকার করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কবি বলেনঃ آدمیاں گم شدند ملك خدا خر گرفت "মানুষ লোপ পাইয়াছে, খোদার রাজ্য গর্দভের শাসনাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে।"

এই আলোচনা কোরআন-হাদীস বুঝিতে আরবী ব্যাকরণের একান্ত প্রয়োজীনয়তা প্রসঙ্গে উঠিয়াছিল। শুধু অনুবাদ পড়িয়া কোরআন-হাদীস বুঝা যায় না। এই কারণেই আমি বলিয়াছিলাম—কোরআনের একটি আয়াত হইতেই বুঝা যায় যে, কোরআন বুঝিতে আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি জানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি তাহা জানে না, শুধু অনুবাদ পড়িয়া সে কোরআন হাদীস বুঝিতে পারে না। যাহাহউক—ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, দুনিয়া যে পরিমাণ প্রত্যাশা করিবে ততটুকু পাইবে না। পক্ষান্তরে আখেরাত কামনার চেয়েও বেশী পাওয়া যায়।

**আখেরাত অন্বেষণের নিয়মঃ** আর একটি আয়াত বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা আবশ্যকঃ

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَاتَمَنّٰى فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ○

অর্থাৎ, "দুনিয়া এবং আখেরাত খোদার মালিকানাধীন, তোমার আকাঙ্ক্ষার বশীভূত নহে।" এখানে প্রশ্ন হয় যে, উভয়টিই যখন তাঁহার মালিকানাধীন, ইহা তো বুঝা গেল না যে, ইহা তিনি কাহাকে দিতে ইচ্ছা করেন। আর কাহাকে ইচ্ছা করেন না। এই প্রশ্নের উত্তর অপর আয়াতে পরিষ্কার প্রদান করিয়াছেন—দুনিয়া তিনি সকলকেও দিতে ইচ্ছা করেন না এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াও দিতে ইচ্ছা করেন না। অথচ আখেরাত তিনি প্রত্যেক অন্বেষণকারীকে দিবেন এবং যে পরিমাণ প্রত্যাশা করিবে তাহা অপেক্ষা অধিক দান করিবেন। অতএব, মানুষ দুনিয়ার প্রত্যাশী হইয়া আখেরাতের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সাধারণ বিবেক হইতে বহু দূরে।

এখন কথা হইল, আখেরাত অন্বেষণ করার তথ্য কি? সাধারণত সকলে জানে যে, ফরয কার্যগুলি পালন এবং নিষিদ্ধ কার্যগুলি হইতে দূরে থাকাই আখেরাতের অন্বেষণ। কিন্তু এখন আমি এমন একটি তথ্য প্রকাশ করিতে চাই, যাহা وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ বাক্যের মর্মার্থ হইতে বুঝা যায়। কেননা, এখানে গাফ্লত অর্থাৎ, অমনোযোগিতার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে। কাজেই ইহার বিপরীত অর্থাৎ, যেকের-ফেকের কাম্য হইবে। যেকের-ফেকের অর্থ স্মরণ ও ধ্যান। অতএব, আখেরাতের অন্বেষণ অর্থ আখেরাতের চিন্তা অন্তরে হাযির রাখা এবং উহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকা। ইহা কঠিন কিছুই নহে, ইহাতে কোন ওযীফা তেলাওয়াতেরও প্রয়োজন নাই। কেবল এতটুকু আবশ্যক যে, অন্তরে আখেরাতের কথা সর্বদা স্মরণ থাকে এবং সর্বদা সেই ধ্যানেই নিমজ্জিত থাকে। প্রথমত স্মরণ ও ধ্যানে থাকিলে তুমি কখনও আখেরাতের রাস্তা হইতে কোন দিকে সরিবে না। কচিৎ সরিয়া গেলেও তৎক্ষণাৎ সচেতন হইয়া পুনরায় পথে ফিরিয়া আসিবে। সেই যেকের-ফেকের লাভ করার সহজ পন্থা এই যে, আহ্লুল্লাহ্র সঙ্গ অবলম্বন কর। মাঝে মাঝে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তাঁহার দরবারে বস, তাঁহার কথা শ্রবণ কর। তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখ। ইহা সম্ভব না হইলে আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনচরিত পাঠ করিলেও সেই ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই মর্মেই আরেফ শীরাযী বলিতেছেন ঃ

دریں زمانه رفیقے که خالی از خلل ست ۔ صراحی مے ناب وسفینۂ غزل ست

"আজকাল ত্রুটিমুক্ত বন্ধু—শরাবপূর্ণ সোরাহী এবং গযলের জাহাজ।" গযলের জাহাজ অর্থ আল্লাহ্ওয়ালাদের অবস্থা এবং উক্তিসমূহের কিতাব। কামেল পীর পাওয়া সম্ভব হইলে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না! সম্ভব না হইলে কখনও অপক্ক পীরের সংস্রবে যাইবে না। ইহা খুবই ক্ষতিকর। অপক্ক পীরের সংসর্গে যাইয়া হারাম কাজের বা কথাবার্তার প্রতি আকৃষ্ট না হইলেও মুবাহ্ কার্যে বাড়াবাড়ি হইবে, অথচ মুবাহ্ কার্যে বাড়াবাড়ি সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। হাদীসে আসিয়াছে— اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَاِنَّهَا تُمِيْتُ الْقَلْبَ "অধিক হাসিও না, অধিক হাসি অন্তরকে মারিয়া ফেলে।" বস্তুত হাস্য করা মুবাহ্, কিন্তু ইহার আধিক্য মারাত্মক, হৃদয়কে মারিয়া ফেলে। হযরত শেখ ফরীদ (রঃ) বলেন ঃ

دل ز پر گفتن بمیرد در بدن ۔ گرچه گفتارش بود در عدن

"অধিক কথা বলিলে দেহের দিল্ মরিয়া যায়, যদিও সেই কথাবার্তা আদনের মোতি অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কেন না হয়!" কথাবার্তা না হইলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থাকিবে, অন্তত মন অনাবশ্যক তাহার প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে। গায়রুল্লাহ্র প্রতি অনাবশ্যক মনকে মশ্গুল রাখাই কি কম ক্ষতি? এই ক্ষতি তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিবেন, যাঁহারা খোদার সহিত মনকে যুক্ত রাখার স্বাদ উপভোগ করিয়াছেন। এই রহস্যের কারণেই আমাদের মুরশিদগণ প্রচলিত 'তাওয়াজ্জুহ্'কে পছন্দ করেন নাই। কেননা, তাহাতে শর্ত এই যে, পীরের দিকে মনে-প্রাণে মনোযোগী থাকিবে, তখন খোদার ধ্যানও যেন পীরের ধ্যানের চেয়ে অধিক না হয়। আমি বলিতেছি না যে, আমাদের বুযুর্গগণ কখনও অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করেন না। কোন কোন সময় খোদা ভিন্ন অন্য দিকেও মনোযোগ অধিক হওয়া সম্ভব। কিন্তু একদিকে ঘটনাক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বে কাহারও প্রতি মনোযোগ অধিক হওয়া, আর অপর দিকে ইচ্ছাপূর্বক কাহারও প্রতি

এমনভাবে মনোনিবেশ করা যে, তখন খোদার কল্পনা আসিলেও উহাকে পরাভূত করিয়া দিতে হইবে। এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য। আমাদের বুযুর্গগণ ইচ্ছাপূর্বক এরূপ করা পছন্দ করেন না। অনিচ্ছাক্রমে অন্য কোন দিকে মনের ধ্যান চলিয়া গেলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। তাঁহাদের নিজেদের অভিলাষ সর্বদা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ থাকা উচিত, কোন কিছুই যেন সে পথে বাধা না হয়। তবে যাঁহারা প্রচলিত তাওয়াজ্জুহ্-এর তরীকা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কোন প্রশ্ন নাই। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল হইলে তাঁহারাও কিছু সওয়াব প্রাপ্ত হইবেন। সওয়াবমূলক উদ্দেশ্য এই হইবে যে, পীরের ধ্যান আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই করা হইতেছে। অতএব, আল্লাহ্‌র জন্য তাওয়াজ্জুহ্ আর আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ একই কথা। কিন্তু প্রেমিক কি কখনও প্রেমাস্পদ ছাড়া ইচ্ছাপূর্বক অন্য কাহারও প্রতি মনোনিবেশ করিতে পারে? এতদসম্পর্কে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। কোন কবি এক মজলিসে একটি কবিতা পাঠ করিলেন ঃ

اس کے کوچه سے جب اُٹھه اهل وفا جاتے هیں ۔ تا نظر کام کرے روبه قفا جائے هیں

"সত্যিকার প্রেমিক যখন তাহার (মাহ্‌বুবের) গলি হইতে উঠিয়া যায়, যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় পিঠপিছা হইয়া হাঁটিয়া যায়।"

সেখানে আরও একজন কবি ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিবাদ করিলেন ঃ

اس کے کوچه سے کب اٹھه اهل وفا جاتے هیں ۔ وه هوسناك هیں جو رو بقفا جاتے هیں

অর্থাৎ, "সত্যিকারের প্রেমিক তাহার (মাহবুবের) গলি হইতে কি কখনও উঠিয়া যাইতে পারে? যাহারা পিঠপিছা হইয়া হাঁটিয়া যায় তাহারাও স্বার্থপর।"

এই কবি আশেক ছিলেন, পূর্বোক্ত কবিতার বিষয়কে আশেকই রদ করিতে পারে। অন্যথায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে উহার মর্ম তো ভালই ছিল, কিন্তু উহা প্রেমসুলভ রুচির বিপরীত ছিল। বন্ধুগণ! আশেকের অভিরুচি শুধু এই যে, এক মুহূর্তের জন্যও মাহ্‌বুব হইতে অমনোযোগী থাকাকে পছন্দ করে না। নিজের তরফ হইতে সে সর্বদা সেদিকেই মনোযোগী থাকে—মাহ্‌বুবের এদিকে লক্ষ্য থাকুক বা না থাকুক। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

ملنے کا اور نه ملنے کا مختار آپ هے ۔ پرتم کو چاهئے که تگ ودولگی رهے

"পাওয়া না পাওয়ার মালিক তিনি। তবুও তোমার উচিত দৌড়-ধাপ জারি রাখা।" মাওলানা রূমী বলেন ঃ

اندریں راه می تراش ومی خراش ۔ تا دم آخر دمے فارغ مباش

"এই রাস্তায় ঘষা-মাজা করিতে থাক। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এক মুহূর্তও অবসর থাকিও না।" এখানে ঘষা-মাজার অর্থ স্মরণে ও ধ্যানে মশ্‌গুল থাকা। সর্বদা সে দিকেই মন লাগাইয়া রাখা, কেন? ঃ

تا دم آخر دمے آخر بود ۔ که عنایت با تو صاحب سر بود

"যেন শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তোমার সাথী থাকে।" আরও এক কবি বলেন ঃ

یك چشم زدن غافل ازاں شاه نباشی ۔ شایدکه نگاهے کند آگاه نباشی

"সেই বাদশাহ্ হইতে এক পলকের জন্যও অমনোযোগী থাকিও না। এমনও হইতে পারে, তিনি কোন সময় তোমার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। অথচ তুমি টেরই পাইবে না।"

বরং আমি আরও একটু বাড়াইয়া বলিতেছি—কেহ যদি বিশৃঙ্খল হয়, নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করিয়া কাজ করিতে না পারে, কোন সময় আল্লাহ্র ধ্যান অধিক হয় আবার হয়তো কিছুই হয় না। অভ্যস্ত ওযীফাও রীতিমত আদায় করিতে পারে না। তাহারও ঘাবড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমার ওস্তাদ রাহেমাহুল্লাহ্র নিকট কোন এক ব্যক্তি আসিয়া বিশৃঙ্খল এবং বিচ্ছিন্নতার অভিযোগ করিল। হুযূর বলিলেনঃ প্রত্যেকের নিরবচ্ছিন্নতা পৃথক পৃথক। স্থায়িত্বের ইহাই এক অবস্থা যে, কখনও হইল কখনও হইল না। অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থার উপরই চলিতে থাকুক। 'যেকের-ফেকের' একদম যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয় ; বরং মাসে ২০ দিন কাজ কর, ১০ দিন করিও না; কিংবা ১০ দিনই কর ২০ দিন পরিত্যাগ কর। শেষ পর্যন্ত যদি এইভাবে চলিতে থাকে, তবে তাহার স্থায়িত্ব ইহাই। সেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইবে না।

একবার আমার এক বন্ধু কবিতায় আমার নিকট একখানা চিঠি লিখিলেন, উহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিয়মানুবর্তিতা এবং নিরবচ্ছিন্নতার অভাবই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইচ্ছা হইল, আমি ছন্দ অনুযায়ী কবিতায় উত্তর দেই। হঠাৎ মস্নবীর একটি কবিতা আমার মনে পড়িল। তাহাতে বন্ধুর পূর্ণ চিঠির উত্তর নিহিত ছিল। আমি আনন্দিত হইয়া লিখিলামঃ

دوست دارد دوست این آشفتگی - کوشش بیهوده به از خفتگی

"বন্ধু এই বিশৃঙ্খলাই ভালবাসেন। নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা অপেক্ষা অনিয়মিত চেষ্টাও ভাল।" আমাদের হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) বলিয়াছেনঃ

بس ہے اپنا ایک بھی نالہ اگر پہنچے وہاں - گرچہ کرتے ہیں بہت سے نالہ وفریاد ہم

"আমাদের একটি ক্রন্দনও যথেষ্ট, যদি আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে। যদিও বহু কান্না আমরা কাঁদিয়া থাকি।"

বরং আমি আরও একটু বাড়াইয়া বলিতেছি—অনিয়ম এবং অস্থায়িত্বের কথা কি? যদি গুনাহ্র কাজও করিয়া ফেলেন তথাপি মনে করিবেন না যে, আল্লাহ্র দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়া গেলেন; বরং ইহার পরেও আল্লাহ্ তা'আলাকেই জড়াইয়া ধরুন এবং মনে করুন যে, গুনাহের প্রতিকারও তিনিই করিতে পারেন।

একবার হযরত মূসার (আঃ) নিকট ওহী আসিলঃ হে মূসা! সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় বান্দা, যে আমার সহিত এমন মহব্বত রাখে, যেমন শিশু তাহার মায়ের সহিত রাখে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "হে খোদা! সেই মহব্বত কিরূপ?" জবাব আসিলঃ "মাতা পুত্রকে মারধর করে, তবুও শিশু মাকেই জড়াইয়া ধরে।" অতএব, গুনাহ্ করিয়াও আল্লাহ্কে ছাড়িবেন না; বরং তাঁহাকেই জড়াইয়া ধরুন। এখন বলুন, ইহার চেয়েও কোন সহজ পন্থা সফলতা লাভের জন্য হইতে পারে? ইহাতে কোনই জটিলতা নাই, কোন ব্যয় নাই, ইহা অবলম্বন করুন। ইহার ফলে এবাদতের উপর স্থায়ী থাকা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে দূরে থাকা সহজ হইয়া পড়িবে। কেননা, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আপনার মহব্বত হইয়া যাইবে। বস্তুত মহব্বত এবং কামনা তো এমন বস্তু যে, এক বেশ্যার মিলনপ্রার্থীও তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয় এবং সমস্ত

ধন-দৌলত উহার পায়ে লুটাইয়া দেয়। তবে কি খোদার প্রার্থী তাঁহার জন্য জান-মাল লুটাইয়া দিতে ইতস্তত করিবে? বিশেষত যখন তিনি আপনার জান্-মাল বিনষ্ট করিতেও ইচ্ছুক নহেন; বরং তিনি সবকিছুকে নিরাপদে রাখিয়া তাহাতে আরও উন্নতি করিয়া দিবার ওয়াদাও করিতেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ "আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।"

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তিনি স্বীয় প্রার্থীকে উভয় জগতে শান্তির আবাসেই রাখিতেছেন। অতএব, যদি আর কিছু নাও পারেন, তবে অন্তত এই সহজ কার্যই অবলম্বন করুন। কেবল আখেরাতের কল্পনা ও ধ্যান করুন; কিন্তু আফসোস্! সাধারণ লোক তো দূরের কথা, ওলামাও ইহাতে ত্রুটি করিয়া থাকেন। আলেমগণ নামায-রোযা তো করেন, কিন্তু ধ্যান, কল্পনা, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক, তাঁহার প্রতি মনোনিবেশ করা, আঁকড়াইয়া ধরা, জড়াইয়া ধরা, মহব্বতে নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া—এসমস্ত নাই। অথচ ইহাছাড়া সফলতা লাভ হইতে পারে না। কেননা, ইহা ব্যতীত নামায-রোযার প্রতি দৃঢ়তা বিপন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক সময় এবাদত-রিয়াযতের ক্ষেত্রে নফসের সঙ্গে সংঘর্ষ করিতে হয়। বলাবাহুল্য, প্রথমত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া কাজ করাই কঠিন। দ্বিতীয়ত উক্ত কাজের উপর স্থায়িত্বের আশা বিরল। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলে নফ্‌সের সংঘর্ষ শেষ হইয়া যায় এবং আমলের উপর স্থায়িত্বের আশা প্রবল হয়; বরং প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া যায়। ইহাকেই জনৈক আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক কবিতায় বলিয়াছেন ঃ

صنمـاره قلندر سزاوار بمن نمـائی ـ که دراز و دور دیدم ره ورسم پا رسائی

"রস্‌মে পারসাঈ" অর্থ শুষ্ক ও রসহীন দরবেশী। আর "রাহে কলন্দর" অর্থ প্রেমের পথ। কবি বলেন, "শুষ্ক এবং রসহীন দরবেশীর পথে উদ্দেশ্য সফল হওয়া বহু দূর। আমাকে প্রেমের পথে চালাইয়া নিন্।" অতঃপর দরবেশীর পথ দূর এবং প্রেমের পথ নিকটবর্তী হওয়ার কারণ বলিতেছেন ঃ

بقمـار خـانه رفتم همه پاکباز دیدم - چو بصومعه رسیدم همه یافتم ریائی

"জুয়ার আড্ডায় যাইয়া দেখিলাম, সকলেই অকপটতার সহিত খেলিতেছে। যখন এবাদতখানায় গেলাম, দেখিলাম সকলেই কপট এবং রিয়াকার।" অর্থাৎ, প্রেমিকদের মধ্যে অন্তরের রোগ অহঙ্কার, রিয়াকারী ইত্যাদি থাকে না। কেননা, প্রেম সবকিছুকেই জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে নীরস দরবেশদের মধ্যে অহঙ্কার, আত্মাভিমান, রিয়াকারী প্রভৃতি দোষ বহু থাকে। অতঃপর কবি বলেন ঃ

بطواف کعبـه رفتم بحـرم رهم ندادنـد که برون در چه کردی که درون خانه آئی
بزمیں چو سجده کردم ز زمیں ندا بر آمد که مرا خراب کردی تو بسجـدهٔ ریـائی

"কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতে গেলে আমাকে হরম শরীফের পথ ছাড়িল না। বলিল, বাহিরে এমন কি করিয়াছ যে, ঘরের ভিতরে আসিতে চাহিতেছ? যমীনের উপর যখন সজ্‌দা করিলাম, যমীন হইতে আওয়ায আসিল ঃ তুমি রিয়াপূর্ণ সজ্‌দা দ্বারা আমাকে অপবিত্র করিয়াছ।" সুতরাং প্রেমের পথের প্রয়োজন, যাহার দ্বারা খোদার সহিত ধ্যান এবং মনোযোগ নিবিষ্ট থাকে। কিতাব পড়িয়া ইহা হাসিল করা যায় না। ইহাব্ পন্থা জনৈক দুনিয়াদার জজ বলিতেছেন ঃ

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا ـ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

“ধর্মানুরাগ কিতাবের দ্বারাও উৎপন্ন হয় না, ওয়াযের দ্বারাও না, টাকা-পয়সার দ্বারাও না। ইহা কেবল বুযুর্গ লোকের অনুগ্রহ দৃষ্টিতেই উৎপন্ন হইতে পারে।” ইহার জন্য প্রেমিক লোকের সংসর্গ লাভের প্রয়োজন রহিয়াছে।

এখন আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি। এই বিষয়টি বর্ণনা করার প্রয়োজনও ছিল এবং মহিলাদের জন্য উপযোগীও ছিল। কেননা, বিষয়টি খুবই সহজ। ইহাতে অতিরিক্ত কাজ করার প্রয়োজন হয় না। এই জন্য আমি বিষয়টিকে বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম, যদিও সময় অনেক নিয়াছি। ফলে অনেকে রৌদ্র-তাপে কষ্ট পাইয়াছেন। কর্তব্য বন্ধনে আবদ্ধ মহিলাগণ পাক-শাকের বিলম্ব হওয়ার কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু কষ্ট হইতেই শান্তি আসে। কোন ক্ষতি নাই। আসল কথা এই যে, বক্তব্য আসিতে থাকিলে আমি উহাকে রোধ করিতে পারি না। অতএব, আমি অপারক ছিলাম। এখন দো'আ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আমলের তওফীক দান করুন। আমীন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

◆

নিজ বাড়ী,
৫ই জিল্‌কাদ, ১৩৪৫ হিজরী

# তেজারাতে আখেরাহ্

[দৈহিক ও আর্থিক এবাদত সম্পর্কে]

■

'উন্নতি' একটি অতি মনোরম শব্দ। কিন্তু অধুনা ইহার সারমর্ম শুধু সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসা। অথচ পবিত্র শরীঅত ইহার মূল কাটিয়া দিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসার নাম-গন্ধও ছিল না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল শুধু ধর্মীয় উন্নতি; ইহারই প্রসংগে তাঁহারা দুনিয়ায়ও এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন—যাহা আজকালকার লোকেরা স্বপ্নেও দেখে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى ـ اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط

## মুসলমানদের একটি ত্রুটি

আমার পঠিত আয়াতটি একটি বড় আয়াতের অংশবিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে মানুষের প্রয়োজনীয় ও নিত্যকরণীয় কার্যসমূহের মোটামুটি বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়াতে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদের ভূরি ভূরি ত্রুটির মধ্যে একটি ত্রুটি তাহাও বটে, যাহা সংশোধনের জন্য এই আয়াতে বলা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে ত্রুটি অনেক, ইহা অনস্বীকার্য। বহু বিষয়ে মুসলমান দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া নিজেদের মনগড়া কাজে লিপ্ত হইয়াছে। 'মুসলমান' মনগড়া কাজে লিপ্ত আছে বলাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, কেবল মুসলমানদের মধ্যেই এই দোষ সীমাবদ্ধ, অন্য জাতির মধ্যে ইহা নাই। বস্তুত কোন কোন নব্য অভিরুচির লোক এরূপ মনেও করিয়া থাকেন। কাজেই কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিন্দা করিতে গিয়া ইহারা অন্য জাতির প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে—অমুক জাতির মধ্যে এই গুণটি খুবই ভাল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তাহা নাই। ইহার মধ্যে কতক এমন গুণেরও উল্লেখ করা হয়, যাহা

বাস্তবিকপক্ষেও প্রশংসার যোগ্য এবং তাহা উল্লেখও করা হয় মুসলমানদের মনে আত্মানুভূতি জাগাইবার জন্য; অর্থাৎ, যাহাদের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের মধ্যে এসমস্ত প্রশংসনীয় গুণ বিদ্যমান। আর ধর্মের কারণে যাহাদের মধ্যে এসমস্ত গুণ পূর্ণমাত্রায় থাকা উচিত ছিল, তাহারা ইহা হইতে শূন্য। বিজাতির এই ধরনের প্রশংসায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অন্য জাতির এমন গুণসমূহের উল্লেখও করা হয়, যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসারই যোগ্য নহে। কিংবা যোগ্য হইলেও উল্লেখ করার উদ্দেশ্য শুধু মুসলমানদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করা, মনে কষ্ট দেওয়া এবং দোষ ব্যক্ত করা। মুসলমান হইয়া মুসলমানদের প্রতি এমন মনোবৃত্তি বড়ই আপত্তিকর। ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, অধিকাংশ মুসলমানেরই অভ্যাস এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এসমস্ত লোক মুসলমানদের প্রতি যেরূপ ঘৃণা পোষণ করে এবং যেরূপ হাবভাব দেখায়, তাহা দেখিয়া প্রত্যেক জ্ঞানীর পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, অন্য জাতির প্রশংসার মাধ্যমে মুসলমানদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। তদুপরি আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণ মুসলমানদের মধ্যে নাই বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসনীয়ও নহে। অর্থাৎ, পবিত্র শরীঅতের দৃষ্টিতে তাহা কাম্যই নহে। যদিও দুনিয়ার কোন স্তরে তাহা দুনিয়াদারগণের কাম্য হইতে পারে। কিন্তু মুসলমান হিসাবে মুসলমানের মুখ দিয়া এই জাতীয় গুণের প্রশংসা বাহির হওয়া ঠিক তেমনই বটে—যেমন কোন ব্যক্তি হাতীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলিলঃ হাতী এত শক্তিশালী জন্তু, উহাকে ওজন করিলে অন্তত ৫০ মণ হইবে। যদিও ইহা প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-সংশোধন ও প্রশংসার ক্ষেত্রে ইহার কোনই মূল্য নাই।

আজকাল যে সমস্ত গুণকে প্রশংসনীয় মনে করা হয়, তাহাও এই জাতীয়ই বটে, যদিও এসমস্ত গুণেরও কোন এক শ্রেণীর উপকারিতা অবশ্যই আছে। যেমন, হাতী ভারী ওজনের হওয়া। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হাতীর এমন বিরাট দেহ বিনাকারণে সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু ইহাকে পূর্ণ প্রশংসার যোগ্য গুণ বলিয়া নির্ণয় করেন নাই। মনগড়া প্রশংসনীয় গুণাবলীর মধ্যে তথাকথিত "উন্নতি" করাও বটে। কেননা, ইহাকে খুবই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করা হয়। এইরূপে আত্মমর্যাদা প্রভৃতি। অতএব, চিন্তা করিয়া দেখুন, শরীঅত এসমস্ত গুণকে প্রশংসার যোগ্য মনে করে কিনা।

**ইতিহাস এবং হাদীসের মধ্যে প্রভেদঃ** উন্নতি খুবই মনোরম একটি শব্দ। অধুনা ইহার সারমর্ম শুধু সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসা, পবিত্র শরীঅত যাহার মূল কর্তন করিয়া দিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের নমুনা। তাঁহারা ইহাকে কখনও কল্পনায় স্থান দেন নাই। জনাব রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কখনও ইহার তা'লীম দেন নাই। হুযূর (দঃ)-এর জীবন-যাপন প্রণালীর এক একটি ঘটনা হাদীস শরীফে সঙ্কলিত রহিয়াছে, তাহা দেখুন। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও আপনি ইহার তা'লীম দেখিতে পাইবেন না। তবে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলিবেন—তাহা হাদীসের অনুরূপ হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে, অন্যথায় উহার কোনই মূল্য নাই। কেননা, ঐতিহাসিকদের বড় দোষ, তাঁহারা নিজের মত অনুযায়ী ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, এযুগের কোন কোন খেয়ালী লেখক মোহাদ্দেসীনে কেরামের উপর দোষারোপ করেন যে, তাঁহারা ঘটনাবলীর বর্ণনায় নিজেদের মত সংযোগ করিয়াছেন। কিন্তু মোহাদ্দেসীনের অবস্থা সম্পর্কে যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা খুবই অবহিত

আছেন যে,—মোহাদ্দেসীনে কেরাম (রঃ) কেমন আমানতদারীর সহিত হাদীসের খেদমত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ ঐতিহাসিকদের উপরই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বন্ধুগণ! মোহাদ্দেসীনে কেরামের আমানতদারী ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? —তাঁহারা কোন বিষয়ের প্রমাণে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া একটু পরেই অপর অধ্যায়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহার বিপরীত একটি বিষয় বর্ণনা করিয়া ইহার প্রমাণেও হাদীস পেশ করিয়া থাকেন। অতএব, বুঝা যায়, হাদীস সঙ্কলনে শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা একত্রিত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; নিজেদের মত প্রমাণিত করা কিংবা নিজেদের মতের পোষকতা করা উদ্দেশ্য নহে। কেননা, এক হাদীসের সহিত যখন বিরোধী আরও একটি হাদীস পেশ করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, উক্ত মোহাদ্দেস ছাহেবের নিজস্ব মত এই পরস্পর-বিরোধী হাদীসদ্বয়ের যেকোন একটির অনুকূলে অবশ্যই হইবে। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন নিজ মতের বিরোধী হাদীসটিও বর্ণনা করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এস্থলে তিনি কোন নির্দিষ্ট মত প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন? অতএব, বুঝিতে হইবে, এস্থলে নিজ মতের পোষকতা করা কখনও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; বরং হুযূরের সমস্ত হাদীস লোকের সম্মুখে পেশ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য, যাহাতে লোকেরা হাদীসগুলিকে যাচাই করিয়া উত্তমরূপে বুঝিয়া লইতে পারে।

অবশ্য ইতিহাসে এরূপ অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক ঐতিহাসিক নিজ মতের পোষকতাকারী ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং অপর ঐতিহাসিক নিজ খেয়ালের অনুকূলে ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকেন। কাজেই হাদীস ও ইতিহাসের মধ্যে যখন এরূপ ব্যবধান দেখা যায়, তখন হাদীসকে নির্ভরযোগ্য এবং উহার প্রতিপক্ষে ইতিহাসকে নির্ভর ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, ইতিহাসে বর্ণিত যে সমস্ত ঘটনা হাদীসের বিপরীত দেখা যাইবে, উহা কিছুই নহে এবং কখনও উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

**ছাহাবায়ে কেরামের লক্ষ্য ছিল ধর্মের উন্নতিঃ** মোটকথা, হাদীস শরীফ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, হুযূরের (দঃ) জীবনপদ্ধতি কিরূপ ছিল এবং অবিকল সেই পদ্ধতিই ছাহাবায়ে কেরামের ছিল। কাজেই ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সুদূরপ্রসারী আশা এবং লালসার নাম-গন্ধও ছিল না। তাঁহারা যে উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন তাহা ছিল ধর্মীয় উন্নতি। অবশ্য সেই ধর্মীয় উন্নতির বশীভূত হইয়া যে সমস্ত পার্থিব উন্নতি তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল, তদ্রূপ পার্থিব উন্নতি আজকালকার লোকেরা স্বপ্নেও দেখিতে পায় না। কিন্তু পার্থিব উন্নতি তাঁহাদের কাম্য কখনও ছিল না। কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্নতিই ছিল তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এরূপ বৈশিষ্ট্যই আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেনঃ

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ○

"আমি যদি তাহাদের যমীনের অধিকারী করিয়া দেই, তখনও তাহারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, উত্তম কার্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং মন্দ কার্য হইতে বারণ করে।"

ইহাই তাঁহাদের মনোবৃত্তির ছবি। ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এখন আপনারা তাঁহাদের মনোবৃত্তি স্মরণ রাখুন এবং নিজেদের মনোবৃত্তিকে ইহার সহিত মিলাইয়া

দেখুন। আল্লাহ্র শপথ? এই মিল দেওয়া আপনাদের পক্ষে ঠিক তেমনই দুষ্কর হইবে, যেমন দুষ্কর সরল রেখাকে বাঁকা রেখার সহিত মিল দেওয়ার চেষ্টা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত সরল রেখার সরলতা এবং বক্র রেখার বক্রতা বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে ঐক্যসাধন কখনও সম্ভব নহে। অনুরূপভাবে আমাদের মনোবৃত্তি বক্র রেখার ন্যায় এবং ছাহাবায়ে কেরামের মনোবৃত্তি সরল রেখার ন্যায়।

আল্হামদুলিল্লাহ্! এক বিশেষ দিক দিয়া এই দৃষ্টান্তটি স্থানোপযোগী হইয়া কল্পনায় আসিয়া পড়িয়াছে। কেননা, বক্র রেখা সরল রেখার সহিত মিলিত হওয়ার অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে যে, উহার কতকাংশ সরল রেখার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং কতকাংশ সরল রেখা হইতে দূরে সরিয়া থাকে। আজকালকার হাল ফ্যাশনের লোকদের আবিষ্কৃত কল্পনা এবং ধারণাসমূহের অবস্থাও তথৈবচ। তাহাদের এক পা যদিও শরীঅত পথের উপর রহিয়াছে; কিন্তু অপর পা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যাহাকে কোন প্রকারের বর্ণনার সাহায্যে শরীঅত পথের সহিত মিল দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ইত্যাকার অবস্থা ও মনোবৃত্তি কেমন করিয়া প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে? মোটকথা, আজকাল লোকেরা মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত প্রশংসনীয় গুণ নাই বলিয়া মত প্রকাশ করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে শরীঅত পথের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতাই রাখে না।

**জাতির প্রতি সমবেদনাশীলদের লোক দেখান সমবেদনা জ্ঞাপনঃ** বিজাতির মধ্যে বিদ্যমান কোন কোন বিষয় যদিও প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসার যোগ্য—যেমন সমবেদনা জ্ঞাপন, স্বার্থ ত্যাগ প্রভৃতি। তথাপি এসমস্ত গুণ মুসলমানদের মধ্যে নাই বলার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করা ছাড়া আর কিছুই নহে। শোক কিংবা সমবেদনা জ্ঞাপন কখনও উদ্দেশ্য নহে; সমবেদনা হইলে অন্যান্য ব্যাপারেও তাঁহাদের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইত। অথচ এই তিরস্কারকারীদের মধ্যেই এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা মুসলমানদের সহিত মেলামেশা করাও পছন্দ করে না। মুসলমানদের সালাম গ্রহণ করাও তাহারা পছন্দ করে না। অবস্থা যখন এইরূপ, সুতরাং কোনরূপেই বলা যায় না যে, মুসলমানদের প্রতি তাহাদের কোন প্রকার সমবেদনা আছে। ক্ষণেকের জন্য যদি তাহা মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি বলিতে হইবে, মুসলমানদেরকে হীন প্রতিপন্ন করার জন্যই এইরূপ সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা সর্বসাধারণ মুসলমানের কোন প্রকার মঙ্গল বা উপকারের আশা কখনও করা যাইতে পারে না।

ইহা প্রকাশ্য কথা, চিকিৎসক রোগীর উপকার তখনই করিতে পারেন যদি রোগীর নিকট আসিয়া তাহার শিরা দেখেন, প্রস্রাব পরীক্ষা করেন, রোগীর মনে সান্ত্বনা প্রদান করেন। এরূপ না করিয়া যদি দূর হইতেই শুধু চেহারা দেখিয়া আজেবাজে ব্যবস্থাপত্র দিয়া চলিয়া যান, তবে কোন জ্ঞানবান লোকেই একথা বিশ্বাস করিবে না যে, এই চিকিৎসক এই রোগীর রোগমুক্তির কারণ হইতে পারে এবং এই রোগী উক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারে। দেখুন, প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যে চিকিৎসক রোগীদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকে, সেই চিকিৎসক দ্বারা কোন রোগী উপকৃত হইতে পারে কি? কেহই পারে না। হাঁ, যে চিকিৎসক রোগীর রোগকে নিজের রোগ মনে করিয়া রোগীর সহিত মিশিয়া যায়, সে চিকিৎসক অবশ্যই রোগীর উপকার করিতে পারে।

কোন একজন চিকিৎসক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, একসময় তাঁহার শহরে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ৬৩ জন রোগী তাঁহার চিকিৎসাধীন ছিল। তন্মধ্যে ৫৩ জন রোগীই আরোগ্য লাভ

করিয়াছিল ; কেবল ১০ জন রোগী পরলোক গমন করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন ঃ "উক্ত ৬৩ জন রোগীর মধ্যে জনৈক রোগীর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, নাড়ি পরীক্ষাকালে তাহার শরীরের অত্যধিক উত্তাপে আমার অঙ্গুলিতে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার রোগমুক্তির জন্য চেষ্টা-তদ্‌বীরে আমি কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই।" মোটকথা, রোগীকে ঘৃণা করিলে কোন চিকিৎসকই রোগীর কোন উপকার করিতে পারেন না।

আজ দেখুন, জাতির চরিত্র সংশোধনের সেই দাবীদারগণ জাতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন ; বরং আমি বলি, নিজেদের সহিতও তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই এবং নিজেদের রোগের চিকিৎসার প্রতিও তাহাদের লক্ষ্য নাই। ইহাই জাতির প্রতি সমবেদনা না থাকার কারণ। কেননা, মানুষ স্বভাবত নিজের হিতই অধিক কামনা করিয়া থাকে ; বরং পরের হিত কামনার মধ্যেও নিজের হিত কামনাই লুপ্ত থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের হিত কামনা করে না, সে পরের হিত কিরূপে কামনা করিবে ? ইহাদের উচিত—প্রথমে নিজেকে সংশোধন করিয়া লওয়া, পরে অপরের সত্যিকারের সংশোধনের চিন্তা করা।

আজ দুনিয়ার অবস্থা এইরূপ—ইস্‌লামের সহানুভূতিতে বড় বড় সভা-সমিতি করা হয় ; কিন্তু নামাযেরও চিন্তা নাই, রোযারও চিন্তা নাই। টাকা-পয়সার এত ছড়াছড়ি যে, দশ জন লোককে খরচ দিয়া নিজের সঙ্গে হজ্জে নিতে পারে, কিন্তু ইস্‌লামের প্রতি মহব্বতের অবস্থা এই যে, নিজেরও হজ্জ করার তওফীক হয় না। চেহারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আপাদমস্তক ইস্‌লামের সম্পূর্ণ বিপরীত। কথাবার্তার প্রতি দৃষ্টি করুন, ধর্মও মযহাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব, নিজেদের রোগ দূরীকরণের চিন্তাই যখন তাহাদের নাই, তখন অপরের রোগে তাহাদের কি সমবেদনা হইতে পারে ?

ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক যুগেরই একটা রীতি আছে। যুগের লোক সেই রীতির উপরই চলিয়া থাকে। বর্তমান যুগের রীতি এই যে, প্রত্যেক বিখ্যাত বা অবিখ্যাত লোক খ্যাতি অর্জনে কিংবা খ্যাতির পূর্ণতা লাভে চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং ইহারই উপায়-উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত হন। তন্মধ্যে একটি উপায় ইহাও যে, সভা-সমিতি কায়েম করিয়া কেহ গভর্ণর, কেহ সেক্রেটারী, কেহ এটা, কেহ ওটা ইত্যাদি যেকোন একটা পদ গ্রহণ করেন এবং সমাজে বিশিষ্ট লোক সাজিয়া সর্বসাধারণ লোক হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন।

আবার রীতিও যদি শরীঅত অনুরূপ হইত, তবুও কিছু লাভের আশা ছিল। কেননা, শরীঅতের সহিত সামঞ্জস্যের বদৌলত একদিন তাহা প্রকৃত রূপে পরিবর্তিত হইতে পারিত। কিন্তু উক্ত রীতি শরীঅতের সহিত যদি বাহ্যিক সামঞ্জস্যশীলও না হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ ক্ষতিকর এবং হলাহলস্বরূপ। এই কারণেই জাতির আভ্যন্তরীণ রোগের চিকিৎসকগণ শুধু এতটুকুকে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন যে, মানুষ কেবল প্রথমে নিজের আকৃতিকে বাহ্যিক শরীঅতের অনুরূপ করিয়া লইবে এবং বাহ্যিক এবাদত স্থায়ীভাবে পালন করিবে। কেননা, তাঁহারা জানেন, এই বাহ্যিক রূপই একদিন সত্যিকারের রূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

আমাদের হযরত হাজী ছাহেব (রঃ) বলিতেন ঃ এবাদতে 'রিয়া' অর্থাৎ, লোক দেখান মনোভাব আসিলেও তাহা করিতে থাক। 'রিয়া' সর্বদা 'রিয়া' থাকে না। অল্প দিনের মধ্যেই অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সেই অভ্যাস হইতেই এবাদতের উৎপত্তি হয়। অতঃপর তাহা খোদার সান্নিধ্যলাভের উপায় হয়।

এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলিতেছেন ঃ

از صفت و از نام چه زاید خیال – واں خیالت هست دلّال وصال

“নাম ও গুণ হইতে কল্পনার উৎপত্তি হয় এবং উক্ত কল্পনা মিলনের প্রতি পথপ্রদর্শক হইয়া থাকে।” কিন্তু ইহা কেবলমাত্র বাহ্যিক অবস্থা, শরীঅতের সহিত সামঞ্জস্যশীল হইলেই হইতে পারে। যদি এতটুকুও না হয়, তবে সংশোধনের কোন পথই নাই।

এই কারণেই আমি বলিতেছিলাম, যদি উক্ত রীতি ও নিয়ম শরীঅতের সহিত বাহ্যিক সামঞ্জস্যশীল হইত, তবে তাহা পরিশেষে সত্যিকারের রূপে পরিবর্তিত হইতে পারিত। কিন্তু বাহ্যিক সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে? সামঞ্জস্যের জন্যও অন্তরে শরীঅতের গুরুত্ব এবং মর্যাদা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এখানে তাহা নাস্তি।

**আলেমদের প্রতি প্রশ্নবাণের স্বরূপ ঃ** আজকালের জ্ঞানিগণ সনাতন শরীঅতকে মৌলবীদের কল্পনাসমষ্টি মনে করে এবং তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের ইহা যথেষ্ট মনে করা উচিত যে, উক্ত জ্ঞানীরা অন্তত হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের প্রশ্নবাণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যদিও আলেমদের প্রতি প্রশ্ন করার শেষফল প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই উপর যাইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তথাপি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো দেখা যায় যে, শুধু মৌলবীদিগকেই তিরস্কারের লক্ষ্যস্থল করা হইতেছে, এই জন্যও তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু প্রশ্নকারীদের অবশ্যই বুঝা উচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রশ্নবাণের ক্রিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই পতিত হয়। কেননা, ضَرْبُ الْغُلَامِ اِهَانَةُ الْمَوْلٰى “চাকরকে প্রহার করিলে মনিবের অবমাননা করা হয়।” যদিও বাহ্যত সে মনিবকে কিছু বলে নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মনিবেরও অপমান হইবে। কেননা, চাকর ও মনিবের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান নাই, যতটুকু প্রহারকারী মনে করিয়াছে; বরং টেড়া চক্ষুবিশিষ্ট লোকের দৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান, ততটুকুই আছে।

কথিত আছে, কোন এক ওস্তাদ তাহার টেড়া চক্ষুবিশিষ্ট এক ছাত্রকে বলিলেন ঃ অমুক তাকে রক্ষিত বোতলটি লইয়া আস। সে তাকের নিকটে যাইয়া একটি বোতলকে দুইটি দেখিতে পাইল এবং ওস্তাদ ছাহেবকে বলিল ঃ এখানে দুইটি বোতল রহিয়াছে, কোন্‌টি আনিব? ওস্তাদ বলিলেন ঃ দুইটি নহে, বরং একটি আছে। সে বলিল ঃ “আমি স্বচক্ষে দেখিতেছি, আপনি আমার চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা মনে করিতেছেন?” ইহাতে ওস্তাদ রাগান্বিত হইয়া বলিলেন ঃ একটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অপরটি লইয়া আস। শাগরেদ বোতলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই দেখিতে পাইল, সেখানে একটিও নাই। বলিতে লাগিল ঃ “এখন তো এখানে একটিও দেখিতে পাইতেছি না।”

কালামে মজীদে لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ আয়াতের তফসীরে মাওলানা (রঃ) এই কাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, যেকোন একজন রাসূলকে অবিশ্বাস করিলেই সমস্ত রাসূলকে অবিশ্বাস করা হয় এবং ইহাতে খোদা তা'আলার অস্তিত্বেরও অবিশ্বাস হইয়া যায়। সুতরাং নায়েবকে অবিশ্বাস করিলে মনিবকেও অবিশ্বাস করা হয়। কাজেই আলেমদিগকে অবিশ্বাস করিলে স্বয়ং হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করা হইবে। এমন কি ইহাতে শেষ পর্যন্ত খোদা তা'আলাকেও অবিশ্বাস করা হইবে। কিন্তু মানুষ এদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; বরং নির্ভয়ে আলেমদের প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

সারকথা এই যে, আজকাল যে সমস্ত সভা-সমিতি কায়েম হইতেছে, তাহা নিরর্থক প্রথাবিশেষ। ইহার বাহিরের রূপও ঠিক নহে। মানুষ কেবল প্রথা মনে করিয়া উহা অবলম্বন করিতেছে। সমাজের হিতসাধন কখনও উদ্দেশ্য নহে। যেমন, আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছিঃ ইহারা যখন নিজেদের ধর্ম-কর্মই নষ্ট করিতেছে, তখন অপরের হিতসাধনের ইচ্ছা কেমন করিয়া করিতে পারে?

**স্বার্থত্যাগের স্বরূপঃ** যদি বলেন, ইহারা পরের ধর্মকে নিজের ধর্ম-কর্মের উপর অগ্রবর্তী রাখিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতেছে। এই কারণে নিজের ধর্ম-কর্ম দুরুস্ত না করিয়া অপরের ধর্ম-কর্ম সংশোধন করিয়া দিতেছে। তবে বুঝিয়া লউন, ত্যাগের অনুমতি কেবলমাত্র পার্থিব ব্যাপারে রহিয়াছে—ধর্মীয় ব্যাপারে নহে। অর্থাৎ, যদি আমরা নিজের কোন পার্থিব স্বার্থ নষ্ট করিয়া অপরের স্বার্থ করিয়া দেই, তবে ইহাকে 'ঈসার' বা ত্যাগ বলা হইবে এবং ইহার অনুমতিও আছে, প্রশংসনীয়ও বটে। কিন্তু নিজের কোন ধর্মীয় স্বার্থ নষ্ট করিয়া অপরের ধর্মীয় স্বার্থ করিয়া দিলে ইহাকে 'ঈসার' বলা যাইবে না। ইহা যদি "ঈসার" বলিয়া গণ্য হইত, তবে দেশদ্রোহী ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক পরার্থকামী হওয়া উচিত। তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গভর্ণমেন্ট হিতৈষী বলা উচিত। কেননা, তাহার মধ্যে এত বড় সহানুভূতি এবং পরার্থ কামনা রহিয়াছে যে, সে নিজের প্রাণও দান করিয়াছে এবং আনুগত্যের ফলে যে সমস্ত স্বার্থ লাভ করিত, তাহা অন্যান্য প্রজাদের জন্য ত্যাগ করিয়াছে।

বন্ধুগণ! ইহা সেই পরার্থ কামনা, যাহা ফেরআউনের মধ্যে ছিল। সে ধর্ম ত্যাগ করিয়া দুনিয়ার উপর সন্তুষ্ট রহিয়াছে। এতদ্‌সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। নীল নদের জোয়ারের উপরই মিসরের কৃষিকর্ম নির্ভর করিত। একবার নীল নদে জলোচ্ছ্বাস হইল না। প্রজাবৃন্দ ফেরআউনের নিকট গিয়া বলিলঃ তুমি খোদায়ী দাবী করিয়া থাক, আর আমরা দুর্ভিক্ষে মরিতে বসিয়াছি। তোমার এই খোদায়িত্ব কোন্ দিন কাজে আসিবে? সে বলিলঃ আগামীকল্য নীল নদে জলোচ্ছ্বাস অবশ্যই হইবে। রাত্রে সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলঃ হে আল্লাহ্! যদিও আমি এমন উপযুক্ত নহি যে, আমার কোন দো'আ কবূল হইবে, কিন্তু আমার সাহস দেখুন, আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়াছি। বেহেশ্‌তের আশা বিসর্জন দিয়াছি। অনন্তকালের নরক-শাস্তিকে বরণ করিয়াছি। এই সমুদয়ের বিনিময়ে কেবল একটি প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার একটি দো'আ কবূল করুন। আমি নীল নদকে আদেশ করামাত্রই যেন উহার জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হয়। ফলত তাহার প্রার্থনা কবূল হইল এবং জলোচ্ছ্বাসও হইল।

এই দো'আ কবূল হওয়ায় কেহ এরূপ সন্দেহ করিবেন না যে, অভিশপ্ত কাফেরের দো'আ কেমন করিয়া কবূল হইল? আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকলের প্রার্থনাই শ্রবণ করেন। সর্বাপেক্ষা অধিক অভিশাপগ্রস্ত শয়তানের দো'আও আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছিলেন। সেই দো'আও আবার এমন সময়ের, যখন তাহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণমাত্রায় রাগান্বিত ছিলেন। সাধারণত এরূপ সময়ের প্রার্থনা কবূল করা হয় না। প্রার্থনাও কেমন বিচিত্র! এমন প্রার্থনা আজ পর্যন্ত কেহই করে নাই। তাহা প্রকাশ্যত কবূল হওয়ার উপযোগীও ছিল না। সে দো'আ করিয়াছিল, رَبِّ اَنْظِرْنِیْٓ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ "হে খোদা! আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দান করুন।" অথচ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তখন তাহার প্রতি এই অভিশাপ আসিয়াছিল اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْٓ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ "নিশ্চয় তোর প্রতি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমার

অভিশাপ।” এমন বিচিত্র সময়ে শয়তানের এমন বিচিত্র প্রার্থনা رَبِّ اَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ যখন কবূল হইয়া গেল, তখন ফেরআউনের দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়া এমন কি অসম্ভব?

শয়তানের এই ঘটনা হইতে কয়েকটি কথা জানা যাইতেছে—(১) তাহার নির্লজ্জতা। মাথার উপর জুতা পড়িতেছে, আর তখনও তাহার দো'আ করিবার সাহস হইতেছে। (২) তাহার দৃঢ়তা। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও তাহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবেই। (৩) আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দো'আ মঞ্জুর করিয়া ফেলিলেন— فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ “তোমাকে অবকাশ দেওয়া হইল।” শত্রুর সঙ্গে যখন আল্লাহ্ তা'আলার এরূপ ব্যবহার, তখন তাঁহার অনুগত বান্দাগণকে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিতে পারেন!

دوستاں را کجا کنی محروم ۔ تو کہ با دشمناں نظر داری

“শত্রুদের প্রতিও যখন তোমার অনুগ্রহ দৃষ্টি রহিয়াছে, তখন বন্ধুদিগকে কেমন করিয়া বঞ্চিত করিতে পার?”

এই কাহিনীটি মুসলমানদের পক্ষে বড়ই আশাপ্রদ। কেননা, সেই দরবারে শত্রুর দো'আই যখন কবূল হইল, তখন আমাদের দো'আ কেন কবূল হইবে না? কিন্তু ইহা সত্য যে, শয়তানের ন্যায় জেদী হইতে হইবে। মোটকথা, ফেরআউনের যেমন সাহস ছিল, আজকালের পরার্থকামীদের সাহসও তেমনি। ফেরআউনের সেই সাহস যদি সাহস আখ্যা পাওয়ার উপযোগী না হয়, তবে আমাদের এই পরার্থ কামনাও সত্যিকারের পরার্থ কামনা নহে।

সুতরাং বুঝা গেল, যে ব্যক্তি নিজের হিতকামী নহে, সে পরের হিতকামীও নহে। অতএব, ইহারা যাহাকিছু করিতেছে, কেবল রীতি পালন করিতেছে। ইহাই সে সমস্ত গুণ, যাহাকে প্রশংসনীয় গুণ আখ্যা দেওয়া হইতেছে। এসমস্ত গুণ মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিয়া দোষারোপ করা এবং অপর জাতির প্রশংসনীয় গুণের মধ্যে গণ্য করা কোন্ পর্যন্ত সমর্থন করা যাইতে পারে? আমাদের মুখে এমন অনেক কথা উচ্চারিত হয়, যাহা প্রাণহীন দেহের মত। দিবা-রাত্র তাহা আওড়ান হইয়া থাকে। যাহাতে মনে হয়—ইহার সমকক্ষ দরদী আর কেহই নাই। কিন্তু হাদীসে যেমন বর্ণিত আছে— لَايُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ “তাহাদের গলদেশ অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে না”, তদ্রূপ তাহাদের এসমস্ত বুলিও হৃদয়ে কিছুমাত্র ক্রিয়া করে না। বক্তার মনেই যখন ঐ সমস্ত উক্তির কোন ক্রিয়া নাই, তখন শ্রোতার মনে কি ছাই ক্রিয়া করিবে? মোটকথা, ইত্যাকার অপমানকরভাবে মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা নিতান্ত গর্হিত কার্য। ইহা হইতে বিরত থাকা ওয়াজেব। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক হইলে এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করার আবশ্যকতা আছে এবং এই শুভেচ্ছায় কোন নির্দিষ্ট মুসলমানের এসমস্ত দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করিয়া তাহাকে সচেতন ও সংশোধন করিয়া দেওয়া দূষণীয় নহে। আমি যদি নির্দিষ্টতার সহিত এরূপ বলি, মুসলমানদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি আছে, তবে ইহাতে কোন নির্দিষ্ট মুসলমানকে বুঝাইবে। তখন আমার লক্ষ্যস্থল হইবে কোন নির্দিষ্ট মুসলমান। এরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র তাহাদের সংশোধনই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকে এত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। প্রসঙ্গক্রমেই দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। আশা করি, ইনশাআল্লাহ্! ইহাতে উপকারই হইবে।

**ধর্মকে বিভক্তিকরণের স্বরূপঃ** এখন এস্থলে বর্ণনীয় একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিতেছি। বর্তমান যুগে আমাদের মধ্যে যত প্রকারের ত্রুটি রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাও একটি ত্রুটি যে,

আমরা ধর্মকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি। অর্থাৎ, ধর্ম-কর্মের কোন কোন বিষয়কে নিজেদের জন্য মনোনীত করিয়া লইয়াছি। যেমন, পুরস্কারের ঘড়ি, রুমাল ইত্যাদি বস্তু বিতরণ আরম্ভ হইলে কেহ ঘড়ি গ্রহণ করে, কেহ এটা, কেহ ওটা। আমার ভাইয়েরা আজকাল ধর্ম-কর্মেও তদ্রূপ আরম্ভ করিয়াছে। কেহ ধর্মের এক অংশের উপর আমল করিতেছে, কেহ অন্য এক অংশের উপর আমল করিতেছে। ইহাকেই কোরআনে বলা হইয়াছেঃ وَجَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ "তাহারা কোরআনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে।" অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ "তোমরা কি কোরআনের এক অংশের উপর ঈমান আনিয়াছ এবং অপর অংশকে অবিশ্বাস করিতেছ?"

এই বিভক্তিকরণ নানা প্রকারের হইয়া থাকে। (১) এক অংশের উপর ঈমান আনিয়া অন্য অংশকে অবিশ্বাস করা। মুসলমান এই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। (২) ধর্মের এক অংশকে বিশ্বাস করিয়াও বর্জন করা। ইহা আবার অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এখানে শুধু একটি প্রকার বর্ণনা করিব। কেহ কেহ শুধু দৈহিক এবাদতকে ধর্ম এবং আর্থিক এবাদতকে ধর্ম বহির্ভূত মনে করিয়াছে। ইহারা আবার নিজদিগকে ধার্মিক মনে করিয়া থাকে। তাহারা ধর্মের কেন্দ্রবিন্দু অধিকতর দৈহিক এবাদতকেই মনে করিয়াছে। আবার কেহ কেহ শুধু আর্থিক এবাদত অবলম্বন করিয়া দৈহিক এবাদতকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছে। একালে উভয় প্রকারের মানুষই বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন কোন বিত্তশালী লোক দৈহিক পরিশ্রম কষ্টকর মনে করিয়া কেবল জনহিতকর কার্যে কিছু টাকা-পয়সা ব্যয় করাই ধর্মের জন্য যথেষ্ট মনে করিতেছেন এবং প্রমাণ এই পেশ করিতেছেন যে, স্থির হিত হইতে সংঞ্চারক হিত অধিক মঙ্গলজনক।

বন্ধুগণ! ইহা অবিকল সেই কথা— كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَبِهِ الْبَاطِلُ "হক কথা উচ্চারণ করিয়া উহার নাহক অর্থ করা।" আর্থিক এবাদত সম্পন্ন করিলে কি আর দৈহিক এবাদতের প্রয়োজন থাকিবে না? ইহার অবশ্য করণীয়তা (وجوب) কি রহিত হইয়া যাইবে? একটু কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করুন। যেখানে اٰتُوا الزَّكٰوةَ 'যাকাত দাও' আসিয়াছে, সেস্থানেই اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ 'নামায আদায় কর'ও আসিয়াছে। কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করিলে কোথাও একথার অবকাশ দেখিতে পাইবেন না যে, আর্থিক এবাদত পালন করিলে দৈহিক এবাদতের প্রয়োজন থাকে না।

তবে কেহ সন্দেহ করিতে পারে—যদি কোরআনে সেই অবকাশ না থাকিল, তবে এই ৭২ ফেরকা কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল?

ইহার উত্তর এই যে, এসমস্ত সম্ভাবনা বা অবকাশ চিন্তনীয় ব্যাপার। চিন্তা না করা পর্যন্ত কোরআন দাতা ব্যক্তির ন্যায়। সকলেই কোরআনের দান পাইতে পারে। মু'তাযেলা সম্প্রদায় কোরআন দ্বারাই নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রমাণ করিতেছে। কাদ্‌রিয়া, মুজাস্‌সেমা এবং মুআ'ত্তেলা সকলে কোরআন দ্বারাই নিজ নিজ উদ্ভট মতবাদের প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে—সত্য মযহাব ভিন্ন অন্য কোন মতবাদেরই প্রমাণ দানের অবকাশ কোরআনে নাই।

يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ **আয়াতের অর্থঃ** আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ○

"তাহারা কি কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? যদি ইহা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও কালাম হইত, তবে তাহারা ইহাতে বহু বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইত।" বুঝা গেল, চিন্তা করার পরেই ইহা

হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে যে, কোরআনে কোন বৈসাদৃশ্য নাই। চিন্তা না করিয়া ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখার কারণেই বৈসাদৃশ্য দেখা যায় এবং চিন্তাও সেই ব্যক্তিরই ধর্তব্য হইবে, যাহার নিকট চিন্তার সামগ্রী ও উপকরণ রহিয়াছে। প্রত্যেকের চিন্তা নির্ভরযোগ্য হইবে না। এই যুগের জ্ঞানীদের চিন্তা তদ্রূপই হইবে যেমন 'গুলিস্তাঁ' কিতাবের নিম্নলিখিত বয়েতের অর্থ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি চিন্তা করিয়াছিল ঃ

دوست آن باشد که گیرد دست دوست - در پریشاں حالی و در ماندگی

"সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু যে ব্যক্তি বিপদে ও দুঃখের সময় বন্ধুর সাহায্য করে।" একদা সেই ব্যক্তির বন্ধুকে কেহ প্রহার করিতেছিল। বন্ধুও দুই একটি আঘাত করিতেছিল। সেই ব্যক্তি তথায় যাইয়া তাহার বন্ধুর উভয় হস্ত ধরিয়া ফেলিল। ফলে সে পূর্ব হইতেও অধিক মার খাইল। ইহার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে সে উত্তর করিল, আমি শেখ সা'দী রাহেমাহুল্লাহ্র কথার উপর আমল করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন ঃ

دوست آں باشد که گیرد دست دوست - در پریشاں حالی و در ماندگی

এই ব্যক্তি গুলিস্তাঁ যেমন বুঝিয়াছে—আমার ভাইয়েরাও কোরআনের মর্ম সম্বন্ধে তদ্রূপই চিন্তা করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের মঙ্গল করুন, কিন্তু বাতেনী কল্যাণের ছায়া অবলম্বনে।

পাঞ্জাবে এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন ঃ "নূতন অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে—বীজের মধ্যেও একটি নর এবং একটি নারী হইয়া থাকে।" আমি বলিলাম ঃ "আচ্ছা তেমনই হউক। কিন্তু তাহাতে কি অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, কোরআনেও এই বিষয়টির উল্লেখ থাকুক ?" কিন্তু তিনি বলিলেন ঃ "আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম—কোরআনের কোথাও ইহার উল্লেখ আছে কিনা।" কয়েক মাস পর্যন্ত চিন্তা করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলাম না। সোবহানাল্লাহ্! বন্ধুগণ! কোরআনে এই মাস্আলাটি তালাশ করা আর 'তিব্বে আকবর' কিতাবে জুতা নির্মাণপ্রণালী তালাশ করা সমান কথা। আপনারাই বলুন, কেহ এরূপ করিলে বর্তমান যমানার জ্ঞানিগণ তাহার সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিবেন ? সে ব্যক্তি সম্বন্ধে একথাই তো বলা উচিত যে, সে তিব্বে আকবর কিতাবে জুতা নির্মাণপ্রণালী খুঁজিতেছে। যাহাহউক, তিনি বলিলেন, কিছুদিন পর একদিন আমার স্ত্রী কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিতে করিতে এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ

"সেই খোদার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা যমীন হইতে উৎপন্ন হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া আমি আনন্দিত হইলাম—কোরআনে এই বিষয়টিও স্পষ্ট ভাষায়ই উল্লেখ রহিয়াছে।

উক্ত ভদ্রলোক ازواج (আযওয়াজ) শব্দের অর্থ স্বামী-স্ত্রী এবং নর-মাদী মনে করিয়াছেন। অথচ ইহার আভিধানিক অর্থ 'জোড়া', যেকোন বস্তুর জোড়াই হউক না কেন। এমন কি زوجی الخف والنعل 'জুতা ও মোজার জোড়াও' বলা হয়। زوج (যওজ) শব্দের অর্থ ফার্সী ভাষায় جفت , উর্দু ভাষায় جوڑا এবং বাংলাভাষায় যুগল বা জোড়া। স্বামী-স্ত্রীকে زوج (যওজ)

এই জন্য বলা হয় যে, তাহারা পরস্পর মিলিয়া এক জোড়া হয়। সকল জায়গায়ই زوج (যওজ)-এর অর্থ স্বামী-স্ত্রী নহে। কেহ যদি বলেঃ میرا جفت پاپوش اُٹھا لاؤ কিংবা میرا جوتے کا جوڑا اُٹھا لاؤ তবে কি ইহার অর্থ এই হইবে যে, "আমার পাপোশ ও জুতার স্বামী-স্ত্রী লইয়া আস ?"

অতএব, আয়াতের অর্থ এই হইবে যে, আমি উদ্ভিদ জাতির প্রত্যেক প্রকারকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। আনার ফলের একটি টক হইলে অপরটি মিষ্ট হয়। এইরূপে অনুমান করিয়া লউন। কিন্তু উক্ত মুজ্‌তাহিদ ছাহেব زوج শব্দের অর্থ স্বামী-স্ত্রী মনে করিয়া নিজের মনগড়া এই মাস্‌আলাটি কোরআনে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অতএব, এই শ্রেণীর লোক কোরআনের মধ্যে চিন্তা করিলে কোরআনের যে দুর্দশা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এই শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্বকালের লোকদের মধ্যেও ছিলেন।

আমার এক ওস্তাদ বর্ণনা করিতেনঃ তাঁহার দরবারে একদিন এক দর্জি বসিয়াছিল। সে প্রথমত পাঠ করিলঃ

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ○

অতঃপর একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিলঃ "মৌলবী ছাহেব! আফসোস, মেঘেরও মৃত্যু আছে?" بَعْدَ الْمَوْتِ শব্দে ع কে (আলিফ) পড়িয়াই এই দুর্দশা ঘটাইয়াছে। অর্থাৎ, بادل موت পড়িয়াই এই বিটকেল অর্থ বাহির করিয়াছে।

আজকাল অনেকে কোরআনের তফসীর লেখা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের তফসীরও ঠিক এই ধরনেরই। কারণ এই যে, তাঁহাদের নিকট চিন্তার সামগ্রী ও উপকরণের অভাব। অর্থাৎ, এল্‌মও নাই, পরহেযগারীও নাই। অতএব, বুঝা যায়, চিন্তারও প্রয়োজন আছে—যাহা আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছেঃ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ অতঃপর تَدَبُّرْ অর্থাৎ, চিন্তার জন্য চিন্তার উপকরণেরও প্রয়োজন। তাহা অতিশয় স্পষ্ট কথা। এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোরআনের মধ্যে চিন্তা করিলে কোন মতভেদের অবকাশ থাকে না। আর যেখানে অর্থ পরিষ্কার বোধগম্য হয় সেখানে তো চিন্তারও প্রয়োজন নাই।

**দৈহিক এবাদত ও আর্থিক এবাদতের মধ্যে পার্থক্যঃ** اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দৈহিক এবং আর্থিক এবাদতের মধ্যে পার্থক্য করা মহাভুল। কেননা, যেখানে যাকাত দেওয়ার আদেশ করা হইয়াছে, সেখানেই নামায কায়েম করার নির্দেশও রহিয়াছে। এই তো গেল দুনিয়াদার আমীর লোকের অবস্থা।

আর এক প্রকারের লোক আছেন, যাঁহাদের উপর ধর্মপ্রবণতা খুব প্রবল। তাঁহারা নিজেদের রুচি অনুসারে আর একটি মনগড়া পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, শরীর খাটাইয়া এবাদত করার মধ্যেই ধার্মিকতা সীমাবদ্ধ। তাঁহারা আর্থিক এবাদত ছদ্‌কা-খয়রাত একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। যেমন, আমি আমার কথাই বলি, কেহ আমার জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিলে সে সহজে খোঁজ করিয়া সন্ধান পাইবে না যে, আমি অমুক জায়গায় দশ টাকা দান করিয়াছি। অনুরূপভাবে আমাদের অনেকের অবস্থাই এইরূপ। মোটকথা, এই বিস্তৃত বিবরণ হইতে বুঝা গেল যে, আমরা ধর্মের বিভিন্ন অংশগুলিকে বিভক্ত করিয়াছি। কেহ কতক

অংশ গ্রহণ করিয়াছে, আর অপর অংশগুলিকে অন্যান্য লোকে অবলম্বন করিয়াছে। ইহা একটি প্রকাশ্য ত্রুটি। আবার ইহার অধীনে বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে।

অর্থাৎ, আবার দৈহিক এবাদতের মধ্যেও পার্থক্য করা হইয়াছে। কেহ শুধু ওযীফা গ্রহণ করিয়াছে। কেহ শুধু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত অবলম্বন করিয়াছে। এক ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ "আমি আমার মুরশিদের তা'লীমকে এমন কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিতেছি যে, নামায ক্বাযা হইলেও মুরশিদের তা'লীম অনুযায়ী ওযীফা কখনও ক্বাযা হয় না।" এইরূপে এবাদতে মালিয়ার মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। কেহ কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করে। এই কারণেই কোন কোন জায়গায় নামাযী অপেক্ষা মসজিদের সংখ্যা অধিক। আনুলা গ্রাম সম্বন্ধে শুনিয়াছি—তথায় অসংখ্য মসজিদ রহিয়াছে। মজার ব্যাপার এই যে, মসজিদের এত আধিক্য সত্ত্বেও কেহ যদি মনোযোগী হয়, তবে নিজের মসজিদ পৃথকই নির্মাণ করার চিন্তা করিবে। আরও মজার কথা এই যে, নূতন মসজিদ নির্মাণ করিয়া পুরাতন মসজিদের আসবাবপত্র অপসারণের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। কেননা, চাঁদা এত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। তখন মৌলবী ছাহেবদের অনুমতি গ্রহণের চেষ্টায় লাগিয়া যায়। "হুযূর! পুরাতন মসজিদ সম্পূর্ণ অনাবাদ, পুনরায় আবাদ হওয়ার আশা নাই। ইহার আসবাবপত্র নূতন মসজিদে লাগাইতে পারি কি?"

আমি আমার মহল্লায় দেখিয়াছি—মানুষ একটি পুরাতন মসজিদ ত্যাগ করিয়া দশ পনর কদম দূরে আর একটি নূতন মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে। এখন কিছুদিন হইতে লোকেরা সেই পুরাতন মসজিদের মেরামতের প্রতিও মনোযোগ দিয়াছে। ফল এই দাঁড়াইবে—যেকোন একটি অনাবাদ হইয়া পড়িবে কিংবা উভয় মসজিদের জামাআত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

কানপুরে এক ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করিল। অন্য সমাজের কোন একজন লোক ইহার মোকাবেলায় আর একটি মসজিদ প্রস্তুত করিল। উভয় মসজিদই যখন প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন নামাযী সংগ্রহের চিন্তা হইল। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইল যে, নামাযের পর মিষ্টি বিতরণ করা হইবে, যেন নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ শুধু এই যে, এসমস্ত লোক মসজিদ নির্মাণকেই অধিক সওয়াবের কার্য মনে করিয়া থাকে এবং একাজে টাকা ব্যয় করিলেই অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করে।

অধিকাংশ সময় দেখা গিয়াছে, এক ব্যক্তি তৈল নিয়া আসিলে তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহা কি তালেবে এল্‌মদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিব, না মসজিদের উদ্দেশ্যে আনা হইয়াছে? তখন সে মসজিদে দেওয়াই স্থির করিয়া দেয়; বরং অধিকাংশ লোকের ধারণা, মসজিদে প্রদীপ জ্বালিলে কবর আলোকিত হয়। এই কারণে কেহ মরিয়া গেলে তাহাকে সওয়াব পৌঁছাইতে হইলে মসজিদে খাদ্যদ্রব্য পাঠান হয়। অন্যত্র দান করা তদ্রূপ সওয়াব মনে করে না।

ইহাতে আরও একটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে যে, সেই খাদ্যদ্রব্যও রাত্রে মসজিদে পাঠান হয়। সম্ভবত তাহারা মনে করে, দিনে তো সূর্য রহিয়াছে, ইহার আলো কিছু না কিছু কবরের মধ্যে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে রাত্রে কবর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে। কাজেই এই খাদ্য এবং প্রদীপের আলো কবরে যাইয়া পৌঁছিবে। দিনে পাঠাইলে তাহা রাত্রেও কাজে লাগিবার আশা আছে। কিন্তু উহাকে এই জন্য পছন্দ করা হয় না যে, খোদা জানেন, তথাকার ব্যবস্থা যথেষ্ট হইবে কিনা। তথাকার কর্মকর্তাগণ কোথাও রাখিয়া দিবেন, পরে ভুলে হয়তো আর কবরে পৌঁছানই

হইবে না এবং সারারাত্র ব্যাপিয়া মুর্দা অন্ধকারে থাকিবে। কাজেই এমন সময়ে মসজিদে খাদ্য ও প্রদীপ দান কর যেন তৎক্ষণাৎ কবরে যাইয়া পৌঁছে।

মুর্দার উদ্দেশ্যে গুড় বিতরণের প্রথাও প্রায় এইরূপই। মনে করা হয়, মৃত্যুকালীন কষ্টের তিক্ততা ইহাতে দূর হইবে। বন্ধুগণ! গুড় তো কখনও কবরে পৌঁছে না এবং এই প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় নাই যে, মিষ্টদ্রব্যের সওয়াবও মিষ্টই হয়।

মোটকথা, এই শ্রেণীর বহু অর্থহীন প্রথা লোকের মধ্যে রহিয়াছে এবং ইহার জন্য মসজিদকেই উপযুক্ত স্থান মনোনীত করা হইয়াছে। কেননা, তাহাদের বিশ্বাস, মসজিদে পাঠাইলে সওয়াব অধিক হয়। আবার মসজিদে নিয়াও খাছ করিয়া মিম্বরের উপর রাখাকে অধিক সওয়াবের কারণ মনে করা হয়। কিন্তু তাহাও আবার ফাতেহা পড়াইয়া দিতে হইবে। তাহাদের ধারণা—অন্যথায় এতগুলি খাদ্যদ্রব্য বিনষ্টই করা হইল।

কতিপয় মেয়েলোক একদিন এশার পরে কিছু মিষ্টি লইয়া কানপুরের জামে মসজিদে আসিল। সেখানেই মাদ্রাসার তালেবে এল্‌মগণ থাকিত। আমি তখন নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল তালেবে এল্‌মগণই মসজিদে ছিল। তালেবে এল্‌মের দল সাধারণত স্বাধীনচেতাই হইয়া থাকে। তাহারা মেয়েলোকদের নিকট হইতে মিষ্টি লইয়া ফাতেহা না পড়িয়াই খাইয়া ফেলিল। ইহাতে উক্ত মেয়েলোকেরা খুব হট্টগোল বাধাইয়া দিল। তাহাদের চীৎকার শুনিয়া তাহাদের ঘরের পুরুষেরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গোলযোগ দেখিয়া জনৈক তালেবে এল্‌ম আমার নিকট দৌড়িয়া আসিল এবং বলিলঃ এই এই কারণে মসজিদে ভীষণ গোলযোগ শুরু হইয়াছে।

আমি মসজিদে আসিয়া দেখিলাম, অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে। অবশেষে আমি তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তালেবে এল্‌মদিগকে তিরস্কার করিলাম, কয়েকজনকে প্রহারও করিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তালেবে এল্‌মদের দ্বারা মিষ্টির মূল্য দেওয়াইলাম। স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, আর কোন দিন এই মসজিদে মিষ্টি আনিও না। মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মাত্র দশ পয়সার মিষ্টি ছিল। অথচ ইহার পরিমাণ এত অধিক ছিল না, যাহা লইয়া এমন গোলযোগ বাধিতে পারে। বিশেষত মিষ্টিগুলি সেই তালেবে এল্‌মদের জন্যই আনা হইয়াছিল। কিন্তু শুধু ‘ফাতেহা’ না হওয়ার কারণে স্ত্রীলোকেরা মনে করিয়াছে, মুর্দার রূহের উপর সওয়াবই পৌঁছে নাই। কাজেই ব্যাপার এই পর্যন্ত গড়াইয়াছে। অথচ আমি কসম করিয়া বলিতে পারি, যদি দশবারও ফাতেহা পড়া হয়, কিন্তু সেই খাদ্য কাহাকেও দান করা বা খাওয়াইয়া দেওয়া না হয়, তবে মুর্দার নিকট কোন সওয়াবই পৌঁছিবে না। পক্ষান্তরে একবারও ফাতেহা না পড়িয়া যদি কোন উপযুক্ত লোককে খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবে যথাযথভাবে সওয়াব পৌঁছিয়া যায়।

জনৈক কৌতুকপ্রিয় দরবেশ বলিয়াছেনঃ কোন একস্থানে ফাতেহার ব্যবস্থা ছিল। আমাকেও দাওয়াত করা হইল। খাদ্য হাযির করিয়া ফাতেহা আরম্ভ করা হইল। ফাতেহা পাঠকারী হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া নাম গুণিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক বিলম্ব হইলে আমি বলিলামঃ জনাব, সারা দুনিয়ার নাম গুণিতে আরম্ভ করিলেন। আমার নামটাও তৎসঙ্গে গণনা করুন না কেন? কেননা, আমি না খাওয়া পর্যন্ত আপনার উচ্চারিত নামসমূহের কেহই তো সওয়াব পাইবে না। ইহাতে তাহারা খুবই রাগান্বিত হইল এবং বলিল, এই ব্যক্তি ‘ওয়াহাবী।’ কিন্তু ফাতেহা পড়ার দীর্ঘ শৃঙ্খলের অবসান ঘটিল। মোটকথা, সাধারণত লোকের ধারণা, ফাতেহা

পড়া না হইলে সওয়াব মুর্দার নিকট পৌঁছে না। আবার এই ফাতেহা পড়ার বিভিন্ন রকমের কায়েদা-কানুনও আবিষ্কার করা হইয়াছে।

কোন এক শাহ্ ছাহেব আমাকে বলিয়াছেনঃ গেয়ারবী শরীফের (১১ই তারিখের) অনুষ্ঠান ১৮ তারিখ পর্যন্ত করা জায়েয আছে। ইহার পরে জায়েয নাই। যেন ইহা নামাযের সময়। অমুক সময় পর্যন্ত থাকিবে, অতঃপর আর জায়েয হইবে না। বন্ধুগণ! দেখুন, এসমস্ত আকীদা পরিত্যাগ করা উচিত কিনা? যদি কেহ বলেন, আমরা এরূপ বিশ্বাসে এসমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছি না, তবে মনে রাখিবেন, আপনাদের কার্য দেখিয়া মানুষ এই প্রকার বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া লইবে।

**শরীঅত হইতে দূরে সরিয়া থাকাঃ** বন্ধুগণ! সাধারণ শ্রেণীর লোক এতটুকু সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে যে, শরীঅত হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, কোন কোন স্থানে “খোদার রাত্রি” পালন করা হয় এবং প্রাতঃকালে খোদার নিরাপত্তার গীত গাহিতে গাহিতে মসজিদে আসিয়া প্রবেশ করে এবং মাথা নোয়াইয়া সালাম করে। মোটকথা, মসজিদ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা, নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্ পাক যেন এখানে বসিয়া রহিয়াছেন। এই কারণেই কেহ কেহ টাকা-পয়সা ব্যয় করার উপযুক্ত ক্ষেত্র মসজিদকেই সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে। কেহ কেহ সমিতি কিংবা মাদ্রাসাকে টাকা-পয়সা ব্যয়ের ক্ষেত্র মনোনীত করিয়াছে। চাই কি তাহা ধর্মীয় মাদ্রাসাই হউক কিংবা দুনিয়াবী শিক্ষাগারই হউক। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা দুনিয়াবী শিক্ষাগারকে নির্ধারণ করিয়াছে, তাহারা তো অনিচ্ছাক্রমে পা উপড়াইয়াও কোন সময় মসজিদের দিকে পতিত হয় না। তাহারা মসজিদ ত্যাগ করিয়া শিক্ষাগারকে ধরিয়াছে। তাহাদের কার্যই হইল শুধু যেই উপায়েই হউক—চাঁদা উসুল করা, অথচ তাহা শরীঅত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। তদুপরি আরও সর্বনাশ এই করে যে, কোন গরীব লোক চারি আনা মূল্যের কিছু দান করিলে ইহার প্রতি লোক দেখান মর্যাদা এইরূপে প্রদান করা হয় যে, ইহাকে নিলামে চড়ান হয়। বাহিরে তো দেখান হয় যে, ইহাতে গরীবের দানের সম্মান করা হইল; অথচ ইহাতে উদ্দেশ্য হয়—এই অজুহাতে বড় অঙ্ক উসুল করা। বন্ধুগণ! এসমস্ত লোক গরীবের মর্যাদা কি বুঝিবে? গরীবের মর্যাদা সে ব্যক্তিই দান করিতে পারে, যে ব্যক্তি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করিয়াছে।

এক সময়ে হযরত মাওলানা গঙ্গোহী (রঃ) পীড়িত অবস্থা হইতে (আরোগ্য লাভ করিলে) তাঁহার পুত্র শোকরানাস্বরূপ বহু লোককে খাওয়ার দাওয়াত করিলেন। মাওলানা (রঃ) নিজের এক খাছ খাদেমকে বলিলেনঃ “গরীব লোকদের আহার শেষ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত খাদ্য, যাহা ভিস্তিদিগকে দেওয়া হয়, তাহা আমার সম্মুখে লইয়া আসিও। আমি সেই ‘তাবাররুক’ খাইব। মনে সন্দেহের স্থান দিও না যে, তাহাদের শরীর পরিষ্কার নহেঃ কাপড় পরিচ্ছন্ন নহে।” তিনি গরীবদের উচ্ছিষ্টকে ‘তাবাররুক’ এই জন্য বলিয়াছেন যে, প্রথমত তাহারা মু'মেন, দ্বিতীয়ত তাহাদের সম্বন্ধে হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ “আমি ভগ্নহৃদয় গরীবদের সঙ্গে আছি।” এই কারণেই হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বলিয়াছেনঃ يَاعَائِشَةُ قَرِّبِى الْمَسَاكِيْنَ “হে আয়েশা! মিস্কীনদিগকে নিকটে স্থান দাও।” যাহাহউক, গরীবদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য হযরত মাওলানার নিকট আনা হইলে অতিশয় আগ্রহের সহিত তিনি তাহা আহার করিলেন। গরীবদের প্রতি এমন সম্মান কেহ কখনও দেখাইয়াছে কি?

আজকাল এই মর্যাদা প্রদানেরও নূতন নূতন প্রতারণামূলক উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। এমন কি গরীবের প্রদত্ত একটি সিকিকে শত শত টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। অথচ ইহাতে ধোঁকাবাজি ছাড়া সুদও হয়। কেননা, এমতাবস্থায় একই জাতীয় বস্তু কম দিয়া অধিক গ্রহণ করা হয়, ইহাই সুদ। আচ্ছা! যদিও সুদের কোন প্রতিকার করিয়াও লওয়া হয়, ধোঁকাবাজির কি প্রতিকার করা যাইবে?

কোন এক স্থানে একটি সিকি নিলামে বিক্রয় হইতেছিল, একজন গরীব লোক যাহাকে শিখান হইয়াছিল, সে উহার মূল্য হাজার টাকা হাঁকিল। নিলামকারীরা তাহার নামের উপরই নিলাম শেষ করিয়া দিল। গরীব লোকটি যখন জানিতে পারিল যে, সিকির নিলাম তাহার নামের উপরই শেষ হইয়াছে, তখন সে কাঁদিতে লাগিল। লোকে তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার কাছে তো কিছুই নাই। আমি তো শুধু এই জন্য হাজার টাকা ডাকিয়াছিলাম যে, আমার ডাকা শুনিয়া লোকে আরও অধিক ডাকিবে এবং তাহাতে সমিতির লাভ হইবে।" অবশেষে এক বক্তা উঠিয়া বলিতে লাগিলেনঃ "সমাজে কি এমন কেহ নাই, যিনি এই উচ্চমনা অসম সাহসী দরিদ্র ব্যক্তির ঋণ নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করিতে পারেন?" অবশেষে, এই দরিদ্র ব্যক্তির জন্য পুনরায় চাঁদা উসুল করা হইল এবং এই উপায়ে হাজারের অঙ্ক পূর্ণ করা হইল।

চিন্তার বিষয়—ইত্যাকার আচরণ সততা হইতে কোন্ পর্যায়ের দূরবর্তী। বন্ধুগণ! সততা এমন বস্তু যাহা আজকাল মুসলমানদের মধ্যে মোটেও নাই। আজকাল তাহাদের প্রত্যেক কথা ও ব্যাপারে অন্য একটি দিক থাকে। অবশ্য অকপট মুসলমানদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ্! এখনও সততা অবশিষ্ট রহিয়াছে। মোটকথা, চাঁদা আদায়ের এই অবস্থা এবং এই ধরনের রুচিসম্পন্নদের এই অবস্থা। তাহারা মনে করে, প্রতারণা ও ধোঁকার সাহায্যে কাজ সমাধা করিয়া ধর্মের উপর পুরাপুরি আমল করিয়াছে। অতঃপর তাহাদের নামাযেরও প্রয়োজন নাই, রোযারও আবশ্যক নাই। নামায যদি পড়েও, তবে নিজ গৃহে। মসজিদে আগমন করা যেন তাহাদের জন্য মাফ।

**বড়লোকদের দুর্বল বাহানাঃ** কোন একজন বড়লোক বলিতে লাগিলেন, মসজিদে কেমন করিয়া যাই। সেখানে বিছানাপত্র ঠিক নাই। ফরাশ-পাখারও ব্যবস্থা নাই। স্থানে স্থানে শেওলা জমিয়া রহিয়াছে। নিজের ঘরে সকল বিষয়েই শান্তি। আমি বলিলামঃ একটু সামলাইয়া অভিযোগ করুন। আপনার অভিযোগ কাহার বিরুদ্ধে? গরীবদের বিরুদ্ধে, না খোদার বিরুদ্ধে? গরীবদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ এই কারণে করিতে পারেন না যে, গরীবদের পক্ষে এতসব আসবাব সংগ্রহ করার সাধ্যই নাই। আর খোদার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই কারণে করিতে পারেন না যে, প্রথমত ইহা খোদার কাজ নহে—আপনাদের কাজ। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা কি ফেরেশ্‌তাদের দ্বারা এই কাজ করাইয়া দিবেন? ইহাও খোদার কাজ যে, তিনি আপনাদিগকে মসজিদের খেদমত করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং তজ্জন্য আর্থিক সামর্থ্যও দান করিয়াছেন। অতএব, বুঝা গেল, আপনাদেরই ত্রুটি। সুতরাং আপনি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন। যদি আপনি মসজিদে যাইতেন, তবে এই অভাব অনুভব করিতেন এবং পূরণের চিন্তা হইত। মজার ব্যাপার এই যে, কোন কোন লোক মসজিদের সাহায্য তো করেই না; বরং মসজিদের আসবাবপত্র নিজের অধিকৃত বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। কেহ নিষেধ করিলে বেচারার উপর রাগান্বিত হইয়া বলে, মসজিদ কি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আমি বলি, না সাহেব; মসজিদ তোমারই স্বত্বাধীন সম্পত্তি, ইহার আসবাবপত্র খুব ব্যবহার কর। জীবনে কখনও মসজিদে কিছু দান করারও তওফীক

হইয়াছিল কি? এসমস্ত লোকের অবস্থা অবিকল সেই কসাইয়ের ন্যায়, যাহার এক আত্মীয় কসাইয়ের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল—আহা! তোমার ছুরি কে গ্রহণ করিবে? তোমার জন্তুগুলি কে নিবে? সে ব্যক্তি প্রত্যেক কথার জবাবে বলিতেছিল, 'আমি গ্রহণ করিব।' ইহাতে ক্রন্দনরত অবস্থায়ই উক্ত স্ত্রীলোকটি বলিল: 'তোমার ঋণ কে পরিশোধ করিবে?' সে ব্যক্তি তখন বলিল: 'বল, ভাই এখন কাহার পালা?'

আমাদের মসজিদগুলিরও ঠিক একই অবস্থা, খেদমতের বোঝা অপরের উপর এবং মসজিদের দ্রব্যাদি ব্যবহারের বেলায় তিনি। এমন কি, কেহ কেহ মসজিদের তক্তাও লইয়া যায়। আবার ধার্মিকদের মধ্যেও একটি রোগ আছে—মসজিদের গরম পানি ওযূ করার জন্য নিজের ঘরে লইয়া যান।

মোটকথা, আমি তাহাকে বলিলাম: 'তোমার কারণেই তো মসজিদের এই অবস্থা।' বলিতে লাগিল, 'মৌলবীরা মসজিদে পাখা লাগাইতে নিষেধ করিয়া থাকে।' আমি বলিলাম: 'আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি পাখা লাগাও।' সে বলিল, মানুষ হট্টগোল করিবে এবং আমার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিবে। আমি বলিলাম: দুই চার দিনে যখন নামাযের কারণে দাসত্বের ক্রিয়া হইবে, ইন্‌শাআল্লাহ্ তখন তুমি নিজেই সেবা গ্রহণের মনোভাব ত্যাগ করিবে। কোন মৌলবীর তোমাকে নিষেধ করার প্রয়োজন হইবে না।

সারকথা এই যে, এই শ্রেণীর লোকেরা কেবল কিছু টাকা-পয়সা খয়রাত করাকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে। আর কেহ কেহ আছে ইহাদের সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র। দৈহিক এবাদতও করে না, আর্থিক এবাদতও করে না। তাহাদের হাতে কিছু টাকা-পয়সা আসিলে তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া দেয়। ইহাদিগকে বারণ করিলে তাহারা বারণকারীদিগকে অন্ধকার যুগের মানুষ বলিয়া আখ্যা দেয়।

এক ব্যক্তি এই শ্রেণীর কোন এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিল: "আমি শুনিতে পাইলাম, তুমি সুদ গ্রহণ করিতেছ।" সে উত্তর করিল, "তুমি আমার ব্যক্তিগত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ?" সোব্‌হানাল্লাহ্! সদুপদেশ প্রদান করা হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হইয়া গেল। শেষ পর্যন্ত সে অনেকক্ষণ বুঝাইবার পর লোকটি বলিল: "ভাই, এখন জায়েয না-জায়েযের বিচার করার সময় নহে। এখন যে প্রকারেই হউক, শুধু টাকা উপার্জন করা দরকার।"

উপরিউক্ত বিবরণ ঐসমস্ত লোকের অবস্থা, যাঁহারা পার্থিব শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা ধর্মীয় শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন, তাঁহারা মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমরা যখন ওয়ায-নছীহত দ্বারা অন্যান্য লোকদিগকে সৎকার্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিতেছি, তখন আমি নিজে কোন টাকা-পয়সা দান করার প্রয়োজন নাই। اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ "সৎকার্যের প্রতি পথ প্রদর্শনকারী সৎকার্যকারীর ন্যায় সওয়াব পাইয়া থাকে।" ইহাতেই যথেষ্ট সওয়াব হইয়াছে। মোটকথা, প্রত্যেক দল নিজ নিজ ধারণানুযায়ী ধর্মের এক সারমর্ম আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, বন্ধুগণ! ভাবিয়া দেখুন, ইহা কত বড় ত্রুটি।

**আল্লাহ্‌র রাস্তার ব্যয় করা সম্বন্ধে ত্রুটি:** কিন্তু আমি এখন উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকারের ত্রুটি হইতে স্থানীয় প্রয়োজনে বিশেষ করিয়া একটি ত্রুটি বর্ণনা করিতেছি। ইহা সর্বক্ষেত্রে প্রবল আকারে দেখা যায়। মানুষ টাকা-পয়সা লিল্লাহ্ খরচ করাকে বড় কঠিন মনে করে। যেখানেই টের পায় যে, এখন দুই চারি পয়সা দান করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া

পালাইবার চেষ্টা করে। এই নির্দিষ্ট ত্রুটির বিষয় বর্ণনা করাতে সম্ভবত কেহ মনে করিতে পারেন, শুধু চাঁদা সংগ্রহের জন্য ওয়ায করা হইতেছে। বন্ধুগণ! যদি আপনারা চাঁদা পছন্দ না করেন, তবে আমি বলিব, হাঁ, নিশ্চয় আমি এখন চাঁদার উৎসাহ প্রদানের জন্যই ওয়ায করিতেছি এবং তাহাই এখন প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু উৎসাহ প্রদান করাকে আমি অপছন্দ করি না। খোদা তা'আলা স্বয়ং কালামে মজীদের মধ্যে স্থানে স্থানে দান করার প্রতি উৎসাহ দিয়াছেন। অবশ্য কালামে মজীদে ইহাকে এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, এবাদত দুই প্রকার। তন্মধ্যে একটি মাল-দৌলত দান করা। অতএব, কালামে মজীদে ইহার যে সম্পর্ক রহিয়াছে, কাহারও ওয়াযের মধ্যে ইহার ততটুকু সম্পর্ক থাকিলে ক্ষতি কি? কালামে মজীদের এই সম্পর্কটুকু বহাল রাখার পন্থা এই যে, হয়তো ওয়াযের মধ্যে উভয়বিধ এবাদতেরই বর্ণনা করা হউক। অথবা কোন ওয়াযে দৈহিক এবাদত সম্পর্কেও বর্ণনা করা হউক। বস্তুত আমার অদ্যকার ওয়াযে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদানই প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও অধিকাংশ ওয়ায়েযদের অভ্যাস, চাঁদার উৎসাহ দিতে হইলে প্রথম হইতে চাঁদার উৎসাহসূচক ওয়ায করেন না; বরং ইহাকে শ্রোতা সাধারণের ঘাবড়াইয়া যাওয়ার কারণ মনে করিয়া অন্য কোন বিষয় অবলম্বনে ওয়ায আরম্ভ করেন এবং মধ্যস্থলে একসময় চাঁদার বিষয় সংযোগ করিয়া এই ওয়াযের শামিল করিয়া লন। আমি এই পন্থার বিরোধী নহি। কেননা, ইহার পাছেও যুক্তি আছে। কিন্তু ইহাতে এতটুকু কথা অবশ্যই আছে যে, এরূপ ওয়াযের প্রত্যেক ওয়াযেই শ্রোতাগণ আশংকা করে যে, হয়তো এখন চাঁদার উল্লেখ করা হইবে। সুতরাং আমি প্রথম হইতেই এই বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছি এবং পুনরায় বলিয়া দিতেছি, এখন শুধু চাঁদার বিষয়ে ওয়ায করা হইবে। যাহার ইচ্ছা শুনুন, যাহার ইচ্ছা চলিয়া যান। যিনি শুনিবেন, নিজের হিতের জন্যই শুনিবেন, আমার ইহাতে কোন লাভ নাই। লাভ বা হিতের অর্থ এই নহে যে, শ্রোতাগণ এখনই এক গাঁঠরি পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু কোরআনে পরিষ্কার ঘোষণা রহিয়াছেঃ

وَمَاتُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَاتُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ ط وَمَاتُنْفِقُوْا
مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ ○

"তোমরা যাহাকিছু খরচ কর, তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য কর; আর তোমরা অন্য কোন উদ্দেশেই ব্যয় করিওনা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। যে ধন-দৌলত তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করিতেছ তাহা তোমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। ইহাতে তোমাদের প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না।" এই আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলিতেছেন?

আপনারা বলিতে পারেন, "আপনার মুখেই আমরা বহুবার শুনিয়াছি, চাঁদা ভিক্ষা করা নিষেধ।" আমার পূর্ণ বক্তব্য-বিষয় মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ না করার কারণেই আপনারা আমার কথা হইতে বুঝিয়া লইয়াছেন—চাঁদা চাওয়া নিষেধ। উপরিউক্ত আয়াতে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, দান-খয়রাতও ধর্মের একটি বিশিষ্ট অংশ।

অবশ্য চাঁদা চাওয়ার কয়েক অবস্থা আছে। তন্মধ্যে যে অবস্থা শরীঅতের সহিত সামঞ্জস্যশীল হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। সামঞ্জস্যশীল হইলে নিন্দনীয় হইবে না। এই নীতি শুধু চাঁদার জন্যই নির্দিষ্ট নহে; বরং নামায-রোযায়ও এই নীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যে নামায শরীঅত অনুযায়ী আদায় করা হইবে, তাহা প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়, অন্যথায় নিন্দনীয়। মনে করুন, যদি কেহ

ওযূ না করিয়া নামায আদায় করে কিংবা কেবলা পশ্চাতে রাখিয়া নামায পড়ে, তবে তাহার নামায নাজায়েয এবং নিন্দনীয়। এইরূপে এই নীতি আর্থিক এবাদতেও রহিয়াছে। চাঁদা দেওয়া জায়েয হওয়ারও কতকগুলি শর্ত আছে। উক্ত শর্ত অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করিলে জায়েয হইবে, অন্যথায় নাজায়েয। তাহাও শুধু চাঁদার সহিত নির্দিষ্ট নহে, 'হাদিয়া-তোহ্ফার' ক্ষেত্রেও এসমস্ত শর্ত মানিয়া চলিতে হইবে।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ত্রুটি দেখা যায় যে, শর্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না এবং এই ত্রুটি চাঁদা গ্রহণকারীদের মধ্যেই অধিক। দাতাদের যেহেতু দেওয়ার অভ্যাসই কম, সুতরাং এসমস্ত দোষ-ত্রুটি হইতে তাহারা রক্ষিত আছেন। অবশ্য গ্রহণকারীরা এসমস্ত দোষে খুবই লিপ্ত রহিয়াছেন। এই দোষ-ত্রুটি দুই জায়গায় প্রকাশ পাইয়া থাকে।

**হাদিয়া কবূল করার শর্তঃ** কেননা, লেনদেনের মোআমালা দুই প্রকারে হইয়া থাকে—(১) বিনিময় গ্রহণে দান। (২) এবং বিনিময়বিহীন দান। বিনিময়ে দান করার মধ্যেও আজকাল দোষ-ত্রুটি অনেক হইতেছে। তথাপি ইহার মধ্যে জায়েযের অবস্থাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু বিনিময়বিহীন দানের মধ্যে কোনই পরোয়া করা হয় না। বিনিময়বিহীন দান দুই প্রকার। হাদিয়া ও চাঁদা। উভয় প্রকারের দানেই মানুষ বিশেষ বেপরোয়া।

হাদিয়ার ক্ষেত্রে এক বেপরোয়াভাব এই যে, কখনও কোন হাদিয়া ফেরত দেওয়া হয় না। যে কেহই হাদিয়া পেশ করুক না কেন, তৎক্ষণাৎ কবূল করা হয়। কেহ কেহ ফেরত দিলেও তাঁহাদের দুর্নাম করা হয় এবং নানাপ্রকার প্রশ্ন করা হয়। বন্ধুগণ! রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের মধ্যে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন, নির্বিচারে সর্বপ্রকারের হাদিয়া কবূল করাও অপছন্দনীয়। হুযূর (দঃ) বলেনঃ

مَا اَتَاكَ مِنْ غَيْرِ اِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ ○

"যে হাদিয়া আগমনের প্রতীক্ষায় তুমি ছিলে না, তাহা আসিলে গ্রহণ কর, না আসিলে ইহার চিন্তায় লাগিও না।" এই হাদীসেই হুযূর (দঃ) হাদিয়া কবূল করা সম্পর্কে একটি শর্তের কথা বলিয়াছেন। ইহাকে হাদিয়ার আদবও বলা যাইতে পারে কিংবা শর্তও বলা যাইতে পারে। আমি এখন সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। যাহাই হউক, হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ নফসের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষমাণ অবস্থা না হওয়া উচিত। আমি ইহা হইতে একটি বিষয় আবিষ্কার করিয়াছি। আবিষ্কার ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। আমি এই বাণী হইতে এই নীতি বুঝিয়াছি যে, কাহারও দরবারে যাতায়াত থাকিলে সদা-সর্বদা হাদিয়া লইয়া যাওয়ার নিয়ম করিয়া লইও না; বরং কখনও কখনও হাদিয়া ছাড়াও চলিয়া যাও। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নিয়ম করিয়া লওয়ার অবস্থায় সেই ব্যক্তির চেহারা দেখামাত্র স্বভাবত মনে এই কল্পনার উদয় হয় যে, "খোদা জানেন, কোন হাদিয়া আনিল কিনা।" ইহাকে اشراف অর্থাৎ, প্রতীক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা বলে। ইহার প্রতিকার এই যে, নফ্সকে এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যেন ইহাতে প্রতীক্ষা বা আকাঙ্ক্ষাই না থাকে, কিংবা আগন্তুককে হাদিয়া আনয়নের বাধ্যবাধকতা হইতে নিষেধ করা উচিত। আমি নিজের জন্য এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছি; বরং হাদিয়া অধিকাংশ সময় না আনাই উত্তম।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছেঃ تَهَادَوْا تَحَابُّوْا “পরস্পরে হাদিয়ার আদান-প্রদান কর, মহব্বত বৃদ্ধি পাইবে।” হুযূর (দঃ) হাদিয়ার আদান-প্রদানকে মহব্বত বৃদ্ধির কারণ বলিয়াছেন। হাদিয়া পাইয়া মন খুশী হইলেই মহব্বত বৃদ্ধি পায়। আবার মনে পূর্ব হইতে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেই তবে হাদিয়া পাইয়া মন খুশী হয়। অন্যথায় আনন্দ পাওয়া যায় না; বরং শুধুমাত্র প্রতীক্ষার কষ্ট দূরীভূত হয়। অতএব, এই হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, হাদিয়ার জন্য নফ্‌সের মধ্যে প্রতীক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা না হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, হাদীস হইতে আরও একটি কথা বুঝা যায় যে, বাইআত গ্রহণের সময় হাদিয়া না নেওয়া উচিত। কেননা, ইহাতেও সেই প্রতীক্ষার অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যেমন, হযরত মাওলানা গঙ্গোহী (রঃ) বলিয়াছেনঃ “ভাই, আজকালকার পীরদের অবস্থা এইরূপ যে, কোন গ্রাম্য লোক তাঁহাদের সম্মুখে মাথা চুলকাইলেও পীর ছাহেব মনে করেন, হয়তো পাগড়ির ভিতর হইতে টাকা বাহির করিতেছে।” ইহা একান্ত সত্য কথা।

**বাতিল পীরের দৃষ্টান্তঃ** লোভ-লালসা আমাদের অবস্থা এরূপ করিয়া দিয়াছে। এক মুরীদ স্বীয় পীরের নিকট একটি স্বপ্ন বর্ণনা করিল যে, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার হাতের অঙ্গুলিসমূহে অপবিত্রতা রহিয়াছে এবং আপনার অঙ্গুলিতে মধু লাগিয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পীর ছাহেব বলিয়া উঠিলেনঃ “তা’বীর তো প্রকাশ্য। তুমি দুনিয়ার কুত্তা এবং আমি আল্লাহ্‌ওয়ালা।” মুরীদ বলিলঃ হুযূর, আমার স্বপ্ন এখনও শেষ হয় নাই। আমি ইহাও দেখিয়াছি যে, আপনার অঙ্গুলি আমি চুষিতেছি আর আমার অঙ্গুলি আপনি চুষিতেছেন। ইহাতে পীর ছাহেব অতিশয় চটিয়া গেলেন। মোটকথা, এই স্বপ্ন সত্য হউক কিংবা মিথ্যা হউক, কিন্তু মুরীদ ইহাতে যেই অবস্থার ছবি আঁকিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে যথার্থ। ইহার সারমর্ম এই যে, মুরীদ ধর্মলাভের জন্য পীরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতেছে এবং পীর মুরীদ হইতে দুনিয়ারূপ মৃতদেহ সঞ্চয়ের ফিকিরে রহিয়াছে। এই শ্রেণীরই এক পীরের এক মুরীদকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলঃ “তুমি পীর হইতে কোন ফল লাভ করিয়াছ কিনা?” মুরীদ উত্তর করিলঃ “মিঞা! চৌবাচ্চায় পানি না থাকিলে লোটায় কোথা হইতে আসিবে?”

এই মর্মের একটি গল্প মনে পড়িয়াছে। বিলগ্রামে একজন বুযুর্গ লোক বাস করিতেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট পড়িতে আসিত। অভ্যাস অনুযায়ী একদিন সে পড়িতে আসিয়া দেখিতে পাইল, ওস্তাদ ছাহেবের চেহারায় দুর্বলতার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল, আজ ওস্তাদজীর বাড়ীতে খাদ্যের অভাব ঘটিয়াছে। অবশেষে সে আজ পড়িবে না বলিয়া ওস্তাদের অনুমতি গ্রহণপূর্বক বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং খাদ্য-সামগ্রী পাকাইয়া ওস্তাদের সমীপে নিয়া হাযির করিল। ওস্তাদ বলিলেনঃ খাদ্য-দ্রব্য অবশ্য ঠিক প্রয়োজনের সময়েই আসিয়াছে; কিন্তু একটি শরীঅতগত কারণ ইহা গ্রহণের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা এই যে, তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই আমার মনে ধারণা হইয়াছিল, তুমি আমার জন্য খাদ্য আনিতেই যাইতেছ। সুতরাং এই খাদ্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষার পরে আসিয়াছে সুতরাং ইহা গ্রহণ করা হাদীস-বিরোধী। সেই শাগরেদও বেশ শিষ্টাচারী ছিল, বাড়াবাড়ি করিল না। তৎক্ষণাৎ বারকোশ লইয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলঃ হযরত! এখন তো আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতীক্ষা থাকে নাই। কেননা, আমি চলিয়া গেলে নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, খাদ্য-দ্রব্য চলিয়া গিয়াছে। অতএব, তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষা বা প্রতীক্ষা ছিল না। কাজেই এখন অনুগ্রহপূর্বক ইহা কবূল করুন। তখন তিনি উক্ত খাদ্য কবূল করিলেন।

সোব্হানাল্লাহ্! অন্তরে মহব্বত থাকিলে খেদমতের নিয়ম আপনাআপনিই বুঝে আসিয়া যায়। যেমন, কোন কবি বলিয়াছেনঃ

شوق در هر دل که باشد رهبرے درکار نیست

"অন্তরে মহব্বত থাকিলে পথপ্রদর্শকের আবশ্যক হয় না।" পক্ষান্তরে আজকাল কোন পীর মুরীদের হাদিয়া গ্রহণ না করিলে মুরীদ তবুও তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে।

**হাদিয়ার নিয়মাবলীঃ** হাদিয়া প্রদানের আর একটি নিয়ম এই যে, ইহাতে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যের মিশ্রণ যেন না হয়। কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে—হাদিয়া প্রদান করিয়া পরে তাবিয লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে। এই শ্রেণীর হাদিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া উচিত।

হাদীসে বর্ণিত আছেঃ এক ব্যক্তি হুযূর (দঃ)-কে একটি উট হাদিয়াস্বরূপ দান করিলে তিনি তদ্‌বিনিময়ে তাহাকে কয়েকটি উট দান করিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি ইহাতে সম্মত হয় নাই। ফলে হুযূর (দঃ) খুবই দুঃখিত হইলেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেনঃ 'অমুক অমুক বংশ ব্যতীত কাহারও হাদিয়া গ্রহণ করিব না।'

কারণ এই যে, সে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশে উক্ত হাদিয়া দিয়াছিল। এই হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ লোক হইতে প্রথম সাক্ষাতে হাদিয়া কবূল করা উচিত নহে। কেননা, প্রথম সাক্ষাতে বুঝা যায় না যে, হাদিয়া প্রদানকারীর নিয়ত কি? এই কারণে আমি এই প্রথা নির্ধারণ করিয়া লইয়াছি যে, নবাগত কাহারও নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করি না। অবশ্য সঠিক লক্ষণে যদি নিঃস্বার্থতা বুঝা যায়, তবে নবাগত ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণেও ক্ষতি নাই। প্রথার পূজারী লোকেরা হাদিয়া প্রদানের কারণ এই আবিষ্কার করিয়াছে যে, পীরের নিকট খালি হাতে গেলে খালি হাতেই ফিরিয়া আসিতে হয়। এ সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্যও প্রচলিত রহিয়াছেঃ "খালি গেলে খালি আসিতে হয়।" এই কারণে যাওয়ামাত্রই পীর ছাহেবের মুষ্টি গরম করিয়া দাও। একটি মূলের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মুষ্টি গরম কথাটি প্রচলিত হইয়াছে। তাহা এই যে, পীরযাদাগণ নিজেদের এই রহস্য গোপন রাখার জন্য মুরীদদিগকে তা'লীম দিয়াছেন যে, 'মুছাফাহা' করার ভিতরে যেন হাদিয়া প্রদান করা হয়, তাহাতে অপর লোক জানিতে পারিবে না।

বন্ধুগণ! প্রথমত, মুছাফাহা একটি স্বতন্ত্র এবাদত। ইহার সহিত দুনিয়া মিশ্রিত করার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়ত, প্রথম ব্যক্তির ন্যায় আরও মানুষ আসিয়াও তো পীর ছাহেবের সহিত মুছাফাহা করিবে। তখন এই ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে যে, পীর ছাহেবকে হাদিয়া প্রদান করা হইয়াছে, তবে গোপন রহিল কোথায়? আর যদি অন্যান্য লোককে মুছাফাহা করিতে নিষেধ করা হয়, তবে তো মুছাফাহা করার মধ্যে কারণ আছে বলিয়া এমনিতেই সন্দেহ হইবে। কেননা, কোন কোন সাবধানতা অসাবধানতার কারণ হইয়া পড়ে।

কথিত আছে, এক ব্যক্তির বিবাহ স্থির হইয়াছিল। সে বিবাহ বাড়ীতে বর সাজিয়া যাওয়ার জন্য অপর এক ব্যক্তির আলোয়ান ধার লইল। বরযাত্রীরা বিবাহআসরে উপস্থিত হইলে লোকে বর দেখিবার জন্য আসিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলঃ বর কে? আলোয়ানের মালিক বরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলঃ বর তো এই ব্যক্তি, কিন্তু আলোয়ানখানা আমার। বর বলিলঃ বন্ধু, তুমিও আশ্চর্য মানুষ! ইহা প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল? সে বলিলঃ আর এরূপ বলিব না।

একটু পরেই আর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেনঃ বর ইনি, কিন্তু আলোয়ান আমার নহে। ইহাতে বর আরও রাগান্বিত হইয়া বলিলঃ খোদার বান্দা। আলোয়ানের উল্লেখ করারই তোমার কি দরকার ছিল? সে বলিলঃ আর এরূপ করিব না। একটু পরে আর একজন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিলঃ বর এই ব্যক্তি, আলোয়ানের কোন উল্লেখ করিব না। অবশেষে বর রাগান্বিত হইয়া আলোয়ান তাহার মাথার উপর ছুঁড়িয়া মারিল। অতএব, যেমন এই ব্যক্তির উক্তি—"আলোয়ান আমার নহে, কিংবা আলোয়ানের কোন উল্লেখ করিব না" বাহ্যত সাবধানতা ছিল, কিন্তু পরিণামের দিক দিয়া ইহা পূর্ণ অসাবধানতা ছিল। এইরূপে একজনের সঙ্গে মুছাফাহা করিয়া সাবধানতার জন্য অপরের সহিত মুছাফাহা না করাতে হাদিয়া গ্রহণের ব্যাপারটা প্রকাশই যখন হইয়া পড়িল, তখন আর গোপনীয়তা কোথায় রহিল? এতদ্ভিন্ন অপরের সঙ্গেও যখন মুছাফাহা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন মুরীদের মনে এই ভয়ও হওয়া উচিত—যদি কেহ পীরের হাত হইতে আমার দেওয়া হাদিয়া মুছাফাহা করার কালে লইয়া পলায়ন করে, তবে তিনি কি করিতে পারিবেন? কেননা, গোপনে লেনদেন হইয়াছে। কাজেই আমার হাতে কিছু ছিল বলিয়া কোন প্রমাণই তো আমার নিকট নাই। যদি বলেন যে, পীর ছাহেব অপরের সহিত মুছাফাহা করার পূর্বে পূর্ব মুছাফাহায় গৃহীত টাকা পকেটে রাখিবেন, তাহাতে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না। আমি বলি, ইহাতে মুছাফাহায় আদান-প্রদানের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইবে। কেননা, পকেটে রাখিতে গেলেই তো গোমর ফাঁক হইয়া যাইবে। আমার এই মন্তব্য ভুল হইলে ঐ ভুল ধরিয়া দেওয়া হউক।

মোটকথা, কেহ কেহ তালীম দিয়া থাকেন, পীরের কাছে যাইতে অবশ্যই কিছু সঙ্গে লইয়া যাইও। অন্যথায় 'যে খালি যায়, সে খালিই আসে।' এই প্রবাদ বাক্যটি অবশ্য সত্য; কিন্তু মানুষ ইহার অর্থ ভুল বুঝিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি এখলাস হইতে খালি হইয়া পীরের নিকট যাইবে, সে পীরের নিকট হইতে খালিই ফিরিবে। পীরকে টাকা দিলেও কোন ফল হইবে না। অর্থাৎ, এখলাস বা খাঁটি নিয়ত না থাকিলে পীরের ফয়েয হইতেও শূন্য থাকিবে। আবার টাকা দিলে পকেটও খালি হইল।

হাদিয়া সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলার প্রয়োজন আছে। অনেক সময়ে হাদিয়ার পরিমাণ এত অধিক হয় যে, তাহা গ্রহণ করা মুশ্‌কিল হইয়া পড়ে। যেমন, কোন ব্যক্তি দশ টাকা পেশ করিল, অনেক সময়ে কোন কারণে ইহা গ্রহণ করা স্বভাবের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এ সম্বন্ধে আমি বহুদিন যাবত চিন্তা করিতেছিলাম যে, উহা প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিলে শরীঅত বিধানের অধীন ইহাকে দাখিল করিয়া লইতে হয়। الحمد لله ইহাও হাদীস হইতে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। হুযূর (দঃ) বলিয়াছেনঃ لَايُرَدُّ الطِّيْبُ فَاِنَّهٗ خَفِيْفُ الْمَحْمِل —যাহা স্বভাবের নিকট কঠিন বোধ হয় না, তাহা গ্রহণ করা সহজ। এই হাদীসে হুযূর (দঃ) হাদিয়া প্রত্যাখ্যান না করার যেই কারণ বলিয়াছেন ইহাতে বুঝা যায়, যেখানে এই কারণ না পাওয়া যায়; বরং স্বভাবের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা মুশ্‌কিল বোধহয়, তেমন হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করা জায়েয। আমি ইহার একটি আনুমানিক পরিমাণ স্থির করিয়াছি যে, কোন ব্যক্তি হইতে তাহার এক দিনের আয়ের অধিক হাদিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। আর একদিনের আয়ের সমপরিমাণ হাদিয়া একবার গ্রহণ করা হইলে পুনরায় এক মাস অতীত হওয়ার পূর্বে তাহার হাদিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কোন ব্যক্তির মাসিক বেতন ৩০ (ত্রিশ টাকা) হইলে তাহা হইতে মাসিক শুধু এক টাকা হাদিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।